৺শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহের

স্মৃতি-কথা

(ইংরাজি হইতে অনূদিত)

অনুবাদক—

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ পালিত

[মূল্য ॥০ আনা ।

৺শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহের

স্মৃতি-কথা

(ইংরাজি হইতে অনূদিত)

অনুবাদক—

শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ পালিত

[মূল্য ॥০ আনা ।

প্রকাশক—
শ্রীবিনয়েন্দ্রনাথ পালিত।
৯।১ মুসলমানপাড়া লেন,
কলিকাতা।

পুস্তকের বিক্রয়-লব্ধ অর্থ শচীন্দ্র চন্দ্রের
ঋণ পরিশোধে ব্যয় হইবে।

শ্রীগৌরাঙ্গ প্রেস,
প্রিণ্টার—সুরেশচন্দ্র মজুমদার,
৭১।১নং মৃজাপুর ষ্ট্রীট, কলিকাতা।

ভূমিকা।

শ্রীহট্টের অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতর কর্ম্মক্ষেত্রে দেশসেবার আকাঙ্ক্ষা যখন তৃপ্তিলাভ করিতে পারিল না, তখন শশীন্দ্র কলিকাতায় আসিয়াছিলেন। বড় আশা ছিল, কিছুদিন এখানকার বৃহত্তর ক্ষেত্রের বিপুল উৎসাহ ও উদ্যমে আপনার অবসন্ন প্রাণকে সঞ্জীবিত করিয়া দেশসেবাতেই জীবনের অবশিষ্ট কাল অতিবাহিত করিবেন। সে অবশিষ্ট কালটুকু যে এত সঙ্কীর্ণ ছিল, আমরা তখন কল্পনাও করিতে পারি নাই—বিধাতা তাহাকে অচিরে ইহলোক হইতে ডাকিয়া লইলেন। শশীন্দ্রের মৃত্যুসংবাদে, বহুদিন পরে, আবার বিধাতা পুরুষের অদ্ভুত সংসার-লীলার এই জীবন-মরণের অভেদ্য রহস্যটা চিত্তকে অভিভূত করিল।

এই সংসারকে কেহ বিধাতার জেলখানা, কেহ বা কারখানা, আর কেহ বা তাঁহার লীলা-রঙ্গালয় বলিয়া ভাবে। আর সংসারটা জেলখানাই হউক, কারখানাই হউক, স্কুলই হউক, কিম্বা খেলাঘরই হউক, যে কর্ম্মভোগ বা কর্ম্মসিদ্ধির ভার লইয়া মানুষ এখানে আসে, সে কর্ম্মটুকু যতদিন. তার আয়ুষ্কালও ঠিক ততদিন—ইহার একচুল এদিক-ওদিক হইবার যো নাই। যার কাজ যখনই ফুরাইয়া যায়, তখনই সে সংসার ছাড়িয়া অনির্দ্দিষ্ট লোকে চলিয়া যায়। শশীন্দ্রের বিধাতানির্দ্দিষ্ট কর্ম্ম যে দিন ফুরাইল, সেদিন আর তাহাকে এখানে ধরিয়া রাখিতে পারা গেল না।

শশীন্দ্রকে আমি কিশোরকাল হইতে চিনিতাম। ১৮৮০ ইংরাজিতে আমি কটক হইতে শ্রীহট্টে ফিরিয়া গিয়া, শ্রীযুক্ত ব্রজেন্দ্র

কিশোর সেন ও শ্রীযুক্ত রাজচন্দ্র চৌধুরী মহাশয়ের সহযোগে শ্রীহট্টে জাতীয় বিদ্যালয় (National School) প্রতিষ্ঠা করি। ব্রজেন্দ্রবাবু দ্বিতীয় ও রাজচন্দ্রবাবু তৃতীয় শিক্ষকের পদ গ্রহণ করেন। পূর্ব্ব বৎসর আমরা তিনজনেই "কটক একাডেমিতে" ছিলাম। আমি প্রধান শিক্ষক ও ইহাঁরা দ্বিতীয় ও তৃতীয় শিক্ষক ছিলেন। শ্রীহট্টের ঐ জাতীয় স্কুলে ও আমরা ঐ পদেই নিযুক্ত হই।

শশীন্দ্র এই স্কুলে আসিয়া ভর্ত্তী হন, বোধ হয় দ্বিতীয় কি তৃতীয় শ্রেণীতে। তখন হইতেই আমি শশীন্দ্রকে জানিতাম।

শশীন্দ্রের পরিবারবর্গের কাহারও কাহারও সঙ্গেও আমার পরিচয় ছিল। হবিগঞ্জ সবডিভিশনের এলাকায়, "রাঢ়িশাল" গ্রামের "সিংহ" বংশ অতি সম্ভ্রান্ত বলিয়া পরিগণিত। বিষয় সঙ্গতি ও বেশ ছিল। আমি যখন বালক, তখন শশীন্দ্রের এক খুল্লতাত একটা ভারি ফৌজদারি মামলায় আবদ্ধ হন। সেই সময় আমার পিতাঠাকুর তাঁহাদের উকীল ছিলেন। সেই সূত্রেই বোধ হয় প্রথমে এই পরিবারের কথা বিশেষভাবে শুনিতে পাই। ইহা ছাড়া ইহাঁদের প্রতিবেশী ও কুটুম্বদিগের মধ্যে কাহারও কাহারও সঙ্গে আমাদের স্বল্পাধিক ঘনিষ্ঠ কুটুম্বিতা ছিল। পরে আমাদের এক দৌহিত্র পরিবারে শশীন্দ্রের এক ভগিনীর বিবাহ হয়। এই সকল কারণে শশীন্দ্রের সঙ্গে তাহার বাল্যকাল হইতেই আমার আত্মীয়তা জন্মে।

শ্রীহট্টে অল্পকাল মধ্যেই আমার শরীর ভাঙ্গিয়া পড়ে। শশীন্দ্র জাতীয় স্কুলের উচ্চতম শ্রেণীতে উঠিবার পূর্ব্বেই আমাকে এই স্কুল ছাড়িয়া আসিতে হয়। ইহার পরে কিছুকাল মহিশূর প্রদেশে বাঙ্গালোর নগরে এক উচ্চ শ্রেণীর ইংরাজি বিদ্যালয়ে প্রধান শিক্ষকের কর্ম্ম করিয়া, আমি ১৮৮৩ ইংরাজিতে কলিকাতায়

ফিরিয়া আসি। বোধ হয়, এই বৎসরই শশীন্দ্রও শ্রীহট্ট হইতে কলিকাতায় আসেন। আমি তখন ভবানীপুরে বাসা করিয়াছিলাম। বাঙ্গালোরে থাকিবার সময়ই সংসার পাতিয়াছিলাম। শশীন্দ্র এই সময়ে প্রায়ই আমার বাড়ীতে আসিতেন ও বাড়ীর ছেলের মতন মাঝে মাঝে আমাদের সঙ্গে থাকিতেন।

ইহার পর বৎসর, ১৮৮৪ ইংরাজিতে, আমি ভবানীপুর ছাড়িয়া কলিকাতায় বাদুরবাগানে উঠিয়া যাই। এই বাড়ীটা বেশ বড় ছিল। নীচের তলার ঘরগুলি খুব উচু ভিটের উপরে ও খট্‌খটে ছিল। প্রচুর রোদ হাওয়া এ সকল ঘরে খেলা করিত। আমার অবস্থাও তখন স্বচ্ছল নয়। শশীন্দ্র এবং আরও দুই তিনটী শ্রীহট্টবাসী শিক্ষার্থী যুবক এই বাড়ীতে আমাদের সঙ্গে বাস করেন। এই সময়ে শশীন্দ্রের সঙ্গে আমাদের খুবই ঘনিষ্টতা জন্মে। আর তখনই শশীন্দ্রের উদারতা, সেবাপ্রবৃত্তি, দেশহিতৈষার বিলক্ষণ পরিচয় পাই।

বোধহয় ইহার পর বৎসরই শশীন্দ্র কলিকাতা ছাড়িয়া দেশে ফিরিয়া যান। বহুদিন আর আমাদের দেখা-শোনা হয় নাই। শশীন্দ্র ইতিমধ্যে শ্রীহট্টের অন্যতম সবডিভিশন করিমগঞ্জে যাইয়া ব্যবসা-বাণিজ্য আরম্ভ করেন। কিন্তু কেবল অর্থোপার্জ্জনে তাহার তৃপ্তি হইল না। দেশ-সেবায় উপার্জ্জিত অর্থ ব্যয় করিতে না পারিলে জীবন ও শ্রম ব্যর্থ হইল ভাবিয়া শশীন্দ্র আপনার সময়, শক্তি ও অর্থ সকলই মাতৃসেবায় নিয়োগ করিবার জন্য আগ্রহান্বিত হইয়া উঠিলেন।

তখন শ্রীহট্টে উল্লেখযোগ্য সাময়িক পত্র ছিল না। শ্রীহট্টের প্রথম সংবাদপত্র "শ্রীহট্ট-প্রকাশ" তখন তিরোহিত হইয়াছে।

শ্রীহট্টের দ্বিতীয় সংবাদপত্র “পরিদর্শক”। ১৮৮০ ইংরাজিতে ইহার প্রতিষ্ঠা হয়। আমি ইহার প্রথম সম্পাদক ছিলাম। “পরিদর্শক” তখন মুমূর্ষু। জেলার লোকমতের উপযুক্ত বাহন ছিল না। এদিকে লোকের অভাব অভিযোগও খুব বাড়িয়া পড়িয়াছে। “শাসনের শৃঙ্খল” ক্রমশঃই শক্ত হইয়া উঠিতেছে। নূতন স্বাদেশিকতা ও দেশাত্মাভিমানের প্রেরণা চারিদিকে ছড়াইয়া পড়িয়াছে। এ সকল দেখিয়া শুনিয়া শশীন্দ্র একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক বাহির করিতে কৃতসংকল্প হইলেন। ফলে, “Weekly Chronicle” প্রকাশিত হইল।

ভূমিষ্ঠ হইয়াই, “Weekly Chronicle” বাঙ্গালা ও আসামের মফঃস্বলের সংবাদপত্রের মধ্যে সর্ব্বপ্রধান স্থান গ্রহণ করিল। ইহার লেখনভঙ্গী, ইহার স্পষ্টবাদীতা ও নির্ভীকতা শিক্ষিত সমাজের আদরণীয় হইয়া উঠিল। রাজকর্ম্মচারিগণের সঙ্গেও খটাখটি লাগিয়া গেল। যতদিন বাঁচিয়া ছিল, এই পত্রখানি শ্রীহট্ট হইতেই প্রকাশিত হয়। কিন্তু বেশী দিন ইহাকে বাঁচাইয়া রাখা সম্ভব হইল না। আসামের এক পুলিশ কর্ম্মচারী ইহার বিরুদ্ধে মানহানির নালিশ রুজু করেন। ইহাতে শশীন্দ্রকে অনেক বেগ পাইতে হয়। রাজকর্ম্মচারীরা কোন দিনই ইহাকে ভাল চক্ষে দেখেন নাই—ক্রমে ইহার উপরে আরও বিরূপ হইতে লাগিলেন। এদিকে ইহার আর্থিক অবস্থাও অত্যন্ত খারাপ হইয়া উঠিল। এই সকল কারণে “Weekly Chronicle”এর প্রচার বন্ধ করা অনিবার্য্য হইল।

কিন্তু শশীন্দ্রের প্রকৃতিতে নিষ্কর্ম্মা হইয়া বসিয়া থাকা অসম্ভব ছিল। ১৯১৪ ইংরাজিতে শশীন্দ্র পুনরায় করিমগঞ্জ হইতে “Eastern Chronicle” নামে একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্র

প্রকাশ করেন। এই নূতন পত্রিকাখানিও ভূতপূর্ব্ব "Weekly Chronicle"এর নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার গৌরব অব্যাহত রাখিয়াছিল। কিন্তু ইহাও অর্থাভাবে এবং দেশবাসীর সহানুভূতির অভাবে ৩।৪ বৎসর মধ্যে উঠিয়া যায়। তখন শ্রীহট্টের অবস্থা নূতন কর্ম্মক্ষেত্র রচনার পক্ষে অনুকূল নহে বুঝিয়া, বাহিরের সম্পন্ন ও দেশহিতৈষী ব্যক্তিগণের অর্থ সাহায্যে পত্রিকাখানি পুনর্জ্জীবিত করিবার উদ্দেশ্যে শশীন্দ্র কলিকাতায় আসিলেন। এখানে আসিয়া তিনি আশার বাণীও শুনিয়াছিলেন। কিন্তু বিধাতা তাহাকে যে কাজের বা যে খেলার জন্য ইহলোকে পাঠাইয়াছিলেন, তাহা ফুরাইয়া গেল। তিনি শশীন্দ্রকে তাঁহার নিকটে ডাকিয়া নিলেন। কে জানে কোন্ কর্ম্মক্ষেত্রে এখন ইহার কর্ম্মপ্রবৃত্তি চরিতার্থতা লাভের চেষ্টা করিতেছে?

শশীন্দ্রের তিরোভাবে শ্রীহট্ট দীন হইয়াছে। নবজাগরণের শঙ্খধ্বনিতে সারা দেশের সঙ্গে শ্রীহট্টও আবার জাগিয়া উঠিয়াছে। শ্রীহট্টে আবার সাময়িকপত্রের প্রতিষ্ঠা হইয়াছে। "জনশক্তি" বাঙ্গালার সাময়িক-পত্র-সমাজে অতি শ্রেষ্ঠ স্থান অধিকার করিতেছে। অতি সম্প্রতি আবার একখানি ইংরাজি সাপ্তাহিকও প্রকাশিত হইতে আরম্ভ করিয়াছে। এ সময়ে শশীন্দ্র ইহলোকে নাই ভাবিলে আত্মীয়স্বজনের অন্তরে দুঃখ হয়, শোকবেগ নূতন করিয়া জাগিয়া উঠে। কিন্তু শশীন্দ্রের জীবন ও কর্ম্ম নিষ্ফল হয় নাই। এই সকল নূতন কর্ম্ম-চেষ্টাই তার প্রমাণ। শশীন্দ্র যে অনুর্ব্বর ভূমিতে প্রাণান্ত পরিশ্রম করিয়া হলচালনা করিয়াছিলেন, দারিদ্র, তাচ্ছিল্য, নির্য্যাতন, বন্ধুদিগের অনাদর ও শত্রুগণের উপহাসের ভিতরে তিনি যে বীজ বপন করিয়াছিলেন, আজ তাহাই

নববসন্ত সমাগমে অঙ্কুরিত ও পল্লবিত হইতেছে দেখিয়া, আত্মীয় স্বজনগণের সান্ত্বনা লাভ করা কর্ত্তব্য।

এই ক্ষুদ্র পুস্তিকার ভূমিকা লিখিয়া দিতে যখন প্রতিশ্রুত হই, তখন আমি জানিতাম না যে, এ সময়ে আমার শরীরের বর্ত্তমান অবস্থাটা ধরা পড়িবে আর ডাক্তারের হুকুমে লেখাপড়া, খাওয়া-দাওয়া, সবই একরূপ বন্ধ করিতে হইবে। এইজন্য শশীন্দ্রের কথা যে ভাবে যতটা লেখা উচিত ও সম্ভব ছিল, তাহা পারিলাম না।

ভবানীপুর,
২৬শে এপ্রিল,
১৯২১ ইং।

শ্রীবিপিনচন্দ্র পাল।

৺শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ।
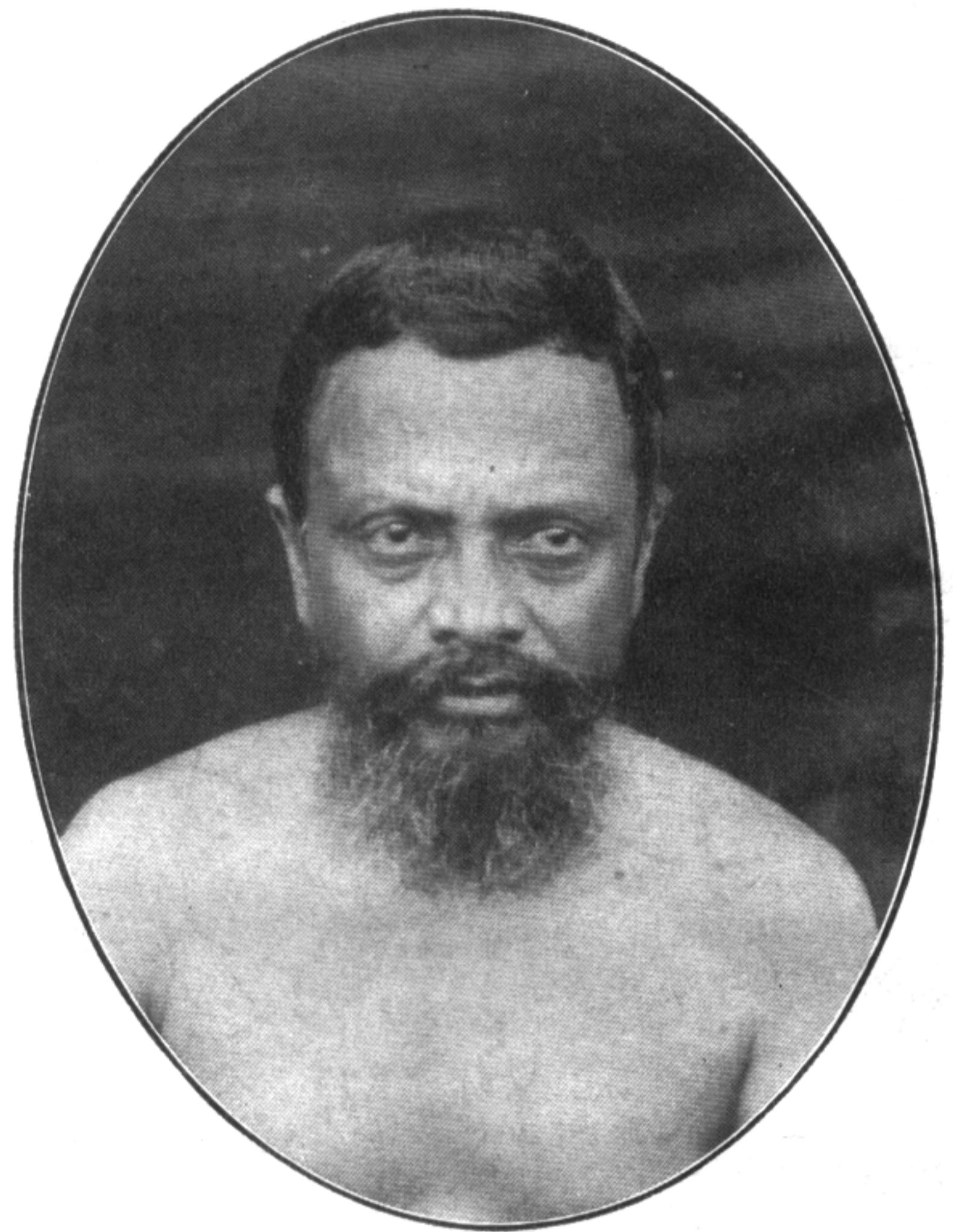
স্মৃতি-কথা

বিশ বৎসর বয়সে বিশ্ববিদ্যালয়ের বিশেষ কোনও শিক্ষালাভ করিতে না পারিয়া আমি কেরাণীরূপে সরকারী কার্য্যে প্রবেশ করিয়াছিলাম, কিন্তু তাহা আমার রুচি ও প্রবৃত্তির অনুরূপ না হওয়ায় কয়েক মাসের মধ্যেই সেই কাজ পরিত্যাগ করি। যখনকার কথা বলিতেছি তখন কেবল আমার শ্বশুরমহাশয়ই এ অঞ্চলে বিলাত হইতে জিনিষপত্রের আমদানি করিতেন এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার চা-কর সাহেবদের সহিত তাঁহার বিস্তৃত কারবার ছিল। সরকারী কার্য্য পরিত্যাগ করিয়া আমি তাঁহারই পরামর্শে ঐ কারবারে একজন সহকারীর পদ গ্রহণ করি।

কারবার উপলক্ষে আমাকে সর্ব্বদা নানাশ্রেণীর সাহেবদের সংস্রবে আসিতে হইত। ইহার ফলে এই হইয়াছিল যে, শ্বেতাঙ্গ দেখিলেই আমাদের দেশের সাধারণ লোকের যে ত্রাস উপস্থিত হয় সেই দৌর্ব্বল্য হইতে আমি আমাকে রক্ষা করিতে পারিয়াছিলাম এবং স্বীয় আত্মমর্য্যাদা অক্ষুণ্ণ রাখিয়া তাহাদের সহিত চলাফেরা করিতে শিখিয়াছিলাম।

এস্থলে একটী কৌতূহলজনক ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি। ব্যবসা সম্পর্কে বিদেশে এবং সাহেব খরিদদার-গণের নিকট চিঠিপত্র লেখার ভার আমার উপর ন্যস্ত ছিল। আমি একবার একজন গণ্যমান্য চা-কর সাহেবের নিকট পত্রলিখিবার সময় Precarious শব্দটি ব্যবহার করায় বিশেষ গোলযোগের সৃষ্টি হইয়াছিল এবং এমন কি কারবারের সর্ব্বনাশ হইবার উপক্রম হইয়াছিল। উক্ত চা-কর সাহেব ১৯০১ খৃষ্টাব্দে বড়লাট বাহাদুরের ব্যবস্থাপক সভার অতিরিক্ত সভ্যরূপে মনোনীত হইয়াছিলেন। যে পত্রে উক্ত শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলাম তাহা অনাদায় পাওনা সম্পর্কে শ্রীহট্ট-ঘোড়দৌড়-সমিতির সম্পাদক হিসাবে তাহাকে লেখা হইয়াছিল। কিন্তু শব্দটি মানহানিসূচক অর্থ প্রকাশ করিতেছে বলিয়া তিনি ব্যাখ্যা করিলেন। সর্ব্বশ্রেণীর সাহেবদের হীনভাবে তোষামোদ করা এবং তাহাদের আনুগত্য স্বীকার করা আমাদের সাধারণ দেশবাসীর মধ্যে তখন প্রথাগত হইয়া পড়িয়াছিল। সেই সময়ে একজন এদেশ-বাসী "নেটিভে"র পক্ষে একজন সাহেবকে, সাধারণ লোক সাধারণ লোককে যেভাবে সম্বোধন করে, সেভাবে সম্বোধন করা প্রায় ধর্ম্মহানির ন্যায় কঠোর পাপাচরণ বলিয়া বিবেচিত হইত। সুতরাং ইহা কিছুমাত্র আশ্চর্য্যের

বিষয় নহে যে, পত্রখানি পাইয়া আমাদের উক্ত শ্বেতাঙ্গ খরিদদারটি এতদূর উত্তেজিত হইয়া পড়িলেন যে, সেই অঞ্চলের সমস্ত চা-কর সম্প্রদায় আমাদিগকে "বয়কট্" বা বর্জ্জন করিবেন বলিয়া কারবারের স্বত্বাধিকারীকে ভয় দেখাইলেন। নিরুপায় স্বত্বাধিকারী তাহাতে ভীত হইয়া পড়িলেন এবং অতি হীনভাবে ত্রুটীস্বীকার করিয়া আসন্নবিপদ নিবারণ করিলেন। আমার মনিবের সহিত আমার নিজের সম্পর্ক একটু সঙ্কোচজনক থাকায় আমি তাঁহার কার্য্যে কোনরূপ প্রতিবাদ করিলাম না। কিন্তু আমি নিজ হইতে "ষ্টেট্স্‌ম্যান্" পত্রিকার তখনকার সম্পাদক রবার্ট নাইট সাহেবকে উক্ত বিষয়ে তাঁহার মতামত জিজ্ঞাসা করিয়া একখানা পত্র লিখি। তিনি অনুগ্রহপূর্ব্বক তাঁহার পত্রিকায় প্রকাশ করিলেন যে, Precarious শব্দটি যে স্থলে ব্যবহৃত হইয়াছে তাহাতে মানহানিসূচক অর্থ প্রকাশ করিতেছে না, তাহা দেনা পরিশোধ করার সময় সম্বন্ধে অনিশ্চয়তা প্রকাশ করিতেছে মাত্র—অর্থাৎ আমি যে অর্থে শব্দটি ব্যবহার করিয়াছিলাম তিনিও শব্দটির ঠিক সেই অর্থই করিলেন। ইহাতে শুধু যে আমার মনিবের নিকট আমার দোষ ক্ষালিত হইয়াছিল তাহা নহে, কাছাড়ের চা-কর সম্প্রদায়ের উপরও উহা আশ্চর্য্য ফল উৎপাদন করিয়া-

ছিল। আমার মনে হইয়াছিল যে, আমি অজ্ঞাতভাবে তাঁহাদের সম্ভ্রমের পাত্র হইয়া পড়িয়াছিলাম। বাস্তবিক উক্ত কারবারের সহিত সংস্রবই আমার শিক্ষার ক্ষেত্র-স্বরূপ হইয়াছিল এবং তাহাই আমার জীবনের ভবিষ্যৎ গতি নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছিল।

এরূপভাবে পাঁচ বৎসর কাল কাটিবার পর আমি কয়েক বৎসরের জন্য জাহাজকোম্পানী সমূহের সব-এজেন্টের কাজ এবং শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার কতকগুলি চা-বাগানের স্থানীয় এজেন্টের কাজ করি। তাহা হইতে প্রায় দশবৎসর কাল পর্য্যন্ত ভদ্রভাবে জীবিকা নির্ব্বাহের জন্য যথেষ্ট সংস্থান হইয়াছিল। এসকল কাজ উপলক্ষে এদেশবাসিগণের, বিশেষতঃ চা-বাগানের শ্রমজীবিগণের প্রতি শ্বেতাঙ্গের ব্যবহার সম্বন্ধে অভিজ্ঞতা লাভ করিবার আমার বিশেষ সুযোগ হইয়াছিল। ইহার ফলে আমার হৃদয়ে এই ধারণাটি বদ্ধমূল হইয়া গিয়াছিল যে, ভারতবাসী আমরা স্বীয় জন্মভূমিতেও "পরবাসীমাত্র"।

আমি স্বভাবতঃই কিঞ্চিৎ ভাবপ্রবণ—পারিপার্শ্বিক জীবনের প্রতি প্রভাবেই সাড়া দেওয়া আমার প্রকৃতি। সুতরাং যৌবনকালে শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বাগ্মিতার মোহিনীশক্তি এবং আমার

শ্রদ্ধাস্পদ গুরু ও ভারতীয় জাতীয়তার মন্ত্রপ্রচারক সুপ্রসিদ্ধ শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের সহিত ঘনিষ্ঠতা সহজেই আমার মনের উপর বিশেষ প্রভাব বিস্তার করিয়াছিল। শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল তখন সবেমাত্র প্রভাত-আকাশে নবারুণের ন্যায় উদিত হইতেছিলেন। সেই সময়ে "ইলবার্টবিল" সম্পর্কীয় ঘোর আন্দোলন দেশ কাঁপাইয়া তুলিয়াছিল এবং যে সমগ্র ভারতব্যাপী রাজনৈতিক আন্দোলন ক্রমে ক্রমে বিকাশ-লাভ করিয়া বর্ত্তমানে "স্বরাজ" আন্দোলনে পরিণত হইয়াছে, তাহারও সূচনা হইয়াছিল। আমি দূর হইতে এই সমস্ত আন্দোলন দেখিতে লাগিলাম এবং বিষয়-কর্ম্মের সহস্র দুশ্চিন্তার মধ্যেও দেশের এই রাজনৈতিক পরিবর্ত্তনে উৎসাহ প্রদর্শন করিতে লাগিলাম। আমি অনুভব করিতে লাগিলাম যে, আমাদের দেশে বিদ্বেষ-মূলক বর্ণভেদই জীবনের সর্ব্বাপেক্ষা দুঃখকর ব্যাপার। বস্তুতঃ আমার ক্ষুদ্র শক্তি দেশের কাজে নিয়োগ করিবার জন্য আমার মনে প্রবল আকাঙ্ক্ষা হইল, কিন্তু আমার নিজের শিক্ষাভাব এবং অবস্থার নিত্য পরিবর্ত্তন এই আকাঙ্ক্ষার পথে প্রধান অন্তরায় হইয়া দাঁড়াইয়াছিল।

১৮৯৭ খৃষ্টাব্দ পুণাসহরের ভীষণ ঘটনাবলীর জন্য বিশেষতঃ শ্রীযুক্ত বালগঙ্গাধর তিলক মহোদয়ের

কারাবরোধের জন্য চির-স্মরণীয় হইয়া রহিয়াছে। ঐ বৎসর হইতে আমার জীবন-স্রোত ভিন্নমুখে প্রবাহিত হইতে আরম্ভ হয়। তখন আমি নিজের বিষয়কর্ম্মের প্রতি সামান্যরকম এবং দেশের জনসাধারণের বা রাজনৈতিক অনুষ্ঠানগুলির প্রতি অধিকতর মনোযোগ দিতে লাগিলাম। তাহার ফলে পত্রিকা-সম্পাদনের কাজ শিখিবার জন্য আমার মনে উচ্চ আকাঙ্ক্ষা জন্মে এবং বৎসরাধিক কাল কঠোর অধ্যয়ন করিয়া উক্ত কাজের যোগ্যতা অর্জ্জন করি।

১৮৯৮ খৃষ্টাব্দের এপ্রিল মাস হইতে আমি সংবাদপত্রে লিখিতে আরম্ভ করি। আমি "অমৃতবাজার পত্রিকা", "বেঙ্গলী" এবং মান্দ্রাজের "হিন্দু" পত্রিকায় প্রবন্ধাদি প্রেরণ করিতাম। দুর্ব্বলের প্রতি সবলের অত্যাচার, বিচার বিভাগে বর্ণবৈষম্য ও আসামের শ্রমজীবি সম্প্রদায় সম্পর্কীয় সমস্যা—এই সকলই প্রধানতঃ আমার লেখার বিষয় ছিল। তখন আসাম প্রদেশে চা-কর ও পুলিশের অত্যাচার কাহিনী লিপিবদ্ধ করিবার উপকরণ যথেষ্ট পাওয়া যাইত। অল্প সময়ের মধ্যেই আমি "বেঙ্গলী" ও "হিন্দু" পত্রিকার কর্ত্তৃপক্ষের দৃষ্টি আকর্ষণ করি। "হিন্দু" পত্রিকা আসামের শ্রমজীবি সম্প্রদায় সম্বন্ধে প্রবন্ধ লিখিতে

টেলীগ্রাম দ্বারা আমাকে বিশেষভাবে অনুরোধ করেন। এই সম্বন্ধে প্রচলিত আইনের সংশোধনের জন্য একটী নূতন আইন ১৮৯৯ খৃষ্টাব্দে ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভায় প্রবর্ত্তিত হইতেছিল। আমি কিঞ্চিৎ গৌরব করিয়া বলিতে পারি যে, উক্ত বিষয়ে আমার সাক্ষাৎভাবে অভিজ্ঞতা থাকায় ঐ বিষয়টি নূতন আকারে দেশবাসীর সম্মুখে ধরিতে পারিয়াছিলাম। আর একটী বিষয়েও আমি গৌরব করিতে পারি—স্যার হেনরি কটন মহোদয় যে তাঁহার মত পরিবর্ত্তন করিয়া অবশেষে আসামের কুলিগণের পক্ষাবলম্বন করিয়াছিলেন, এই ব্যাপারেও আমার কতকটা হাত ছিল। অনেকের নিকট আশ্চর্য্য-জনক মনে হইতে পারে কিন্তু ইহা সত্য যে, স্যার হেনরি কটন যখন আসামের শাসনভার গ্রহণ করেন তখন চা-কর সম্প্রদায়ের সহিত তাঁহার সম্পূর্ণ সহানুভূতি ছিল। চা-করগণ আসামের বিরাট অরণ্যকে ধনপ্রসূ উদ্যানে পরিণত করিয়াছেন বলিয়া তিনি প্রথমে তাহাদিগের যথেষ্ট পোষকতাই করিতেন। আসাম হইতে তাঁহার কার্য্যাবসানের প্রাকালে তাঁহার শাসন কার্য্যের সমালোচনা করিয়া আমি যে বিস্তৃত প্রবন্ধ লিখি তাহাতেও বিষয়টি উল্লেখ করিয়াছিলাম। তাহাতে লিখিয়াছিলাম—"বলা অন্যায় হইবে না যে, শাসনভার

গ্রহণ করিবার সময়ে তিনি যে সকল অভিমত পোষণ করিতেন তাহা বিগত ২ বৎসরের মধ্যে সবিশেষ পরিবর্ত্তিত হইয়াছিল। ইহাতে বুঝা যায় যে, তাঁহার উদার মন যুক্তি ও প্রমাণের বশীভূত ছিল এবং এ দেশের সাধারণ রাজকর্ম্মচারিগণের ন্যায় অহঙ্কারে পূর্ণ ছিল না।”

কাছাড় জেলার কোন একটী চা-কর-কুলী সংক্রান্ত মোকদ্দমা উপলক্ষে চিফ্ কমিশনার স্যার হেনরি কটন যে সুপ্রসিদ্ধ মন্তব্য লিপিবদ্ধ করিয়াছিলেন তাহার জন্যও আমি অনেকাংশে দায়ী। মন্তব্যটির এক স্থলে এরূপ লিখা ছিল—“চিফ্ কমিশনার সাহেবের মতে, মোকদ্দমাটি তৎসম্পর্কিত উচ্চপদস্থ রাজকর্ম্মচারিগণের বিশেষ লজ্জার কারণ হইয়াছে। জেলার ডেপুটি কমিশনার ও পুলিশসাহেবের কার্য্যকলাপ হইতে এই ধারণা জন্মে যে, চা-বাগানের ম্যানেজারগণ যখন ফৌজদারি অভিযোগ আনয়ন করেন তখন তাঁহারা ম্যানেজারের হস্তে পরিচালিত যন্ত্রস্বরূপ কার্য্য করেন এবং ম্যানেজারগণের অঙ্গুলিনির্দ্দেশ ও ইঙ্গিত মতে লোককে গ্রেপ্তার এবং বিচারার্থ প্রেরণ করিবার জন্য আদেশ দিতে বাধ্য হন।” ১৯০১ খৃষ্টাব্দের নভেম্বর মাসে চিফ্ কমিশনার স্যার হেনরি কটন করিমগঞ্জ

পরিদর্শন কালে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য আমাকে বিশেষভাবে আহ্বান করেন। আমার সঙ্গে ঘণ্টাখানেক ভারতবর্ষের জনসাধারণ ও অবস্থা সম্বন্ধে তাঁহার আলাপ হয়। ঐ আলাপ প্রসঙ্গে পূর্ব্বোক্ত মন্তব্যটি সম্বন্ধে তিনি আমাকে কতক আভাস দিয়াছিলেন। আমি উহার একখণ্ড নকল চাহিলে তিনি তাহা দিতে অস্বীকার করেন। কিন্তু যে কোন প্রকারেই হউক অল্পকাল মধ্যে তাহা "অমৃতবাজার পত্রিকা"য় প্রকাশিত হয়।

কুলী-সমস্যা সম্বন্ধে প্রবন্ধ লেখা ছাড়া ও আমি সময়ে সময়ে প্রবঞ্চক আরকাঠিদের ফাঁদ হইতে বহু-সংখ্যক কুলীর উদ্ধার-কার্য্যে সাহায্য করিবার সুযোগ পাইয়াছিলাম। অনেক অল্পবয়স্কা স্ত্রীলোক দুষ্টবুদ্ধি আরকাঠিগণের কৌশলে কুলীদলভুক্ত হইয়া চা-বাগানে আনীত হইবার সময় ট্রেণে ও জাহাজে আমার দৃষ্টিপথে পড়িয়াছে এবং আমার সাহায্যে বিপদ হইতে রক্ষা পাইয়াছে। ইহা ব্যতীত সুদূর বর্দ্ধমান বা বাঁকুড়া জেলা হইতে অনেক লোক তাহাদের নিরুদ্দিষ্ট আত্মীয় স্বজনের অনুসন্ধানে আসিয়া আমার সাহায্যে তাহাদিগকে বিভিন্ন চা-বাগান হইতে উদ্ধার করিয়াছে, এরূপও অনেক ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি।

১৯১০ খৃষ্টাব্দ হইতে আমি "উইক্লি ক্রনিকেল" (Weekly Chronicle) নামে আমার নিজস্ব এক খানি ইংরাজি সাপ্তাহিক পত্রিকা প্রকাশ করি। প্রায় নয় বৎসর পরে পত্রিকাখানির বৈচিত্র্যময় জীবনের অবসান হয়। পত্রিকাখানি নির্ভীকভাবে অন্যায়কার্য্যের সমালোচনা করিত এবং সর্ব্বদা দুর্ব্বল ও উৎপীড়িতের পক্ষ অবলম্বন করিয়া মতামত প্রকাশ করিত। কার্য্যক্ষেত্রেও পত্রিকাখানি যে ফল উৎপাদন করিয়াছিল তাহা নিতান্ত নগণ্য নহে। স্পষ্টবাদী ও স্বাধীনচেতা বলিয়া উহা সহযোগীদের মধ্যে বিশেষ প্রসিদ্ধি লাভ করিয়াছিল এবং আসামের শাসনবিভাগ ও চা-কর সম্প্রদায়ের নিকট উহা কণ্টকস্বরূপ হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। চা-কর সম্প্রদায়ের মধ্যে পত্রিকাখানি কিরূপ উদ্বেগ সঞ্চার করিয়াছিল তাহা "উইক্লি ক্রনিকেলে" প্রকাশিত জনৈক ভারতহিতৈষী চা-করের নিম্নের পত্র হইতে কতকটা বুঝা যাইবে—"আপনার ও আপনার পত্রিকা সম্বন্ধে চা-করগণ খুব বিরুদ্ধভাব পোষণ করিলেও আপনি নিজের ইচ্ছামত নির্ভীকভাবে লিখিতে কখনও ত্রুটি করিবেন না। আমি নিজে ইউরোপবাসী হইলেও এদেশবাসীর সহিত আমার বিলক্ষণ সহানুভূতি আছে এবং তাহাদের প্রতি (বিশেষতঃ এই মহকুমায়)

ইউরোপীয়ানরা যে অসঙ্গত ও অযথা রূঢ় ব্যবহার করেন আমি তাহার ঘোর প্রতিবাদী। প্রত্যেক জিনিষেরই দুইটা দিক আছে। জেম্‌স্ পিটার সাহেবের পত্র পড়িলে এ দেশবাসী প্রত্যেক চিন্তাশীল ব্যক্তির মনেই ঘৃণার উদ্রেক হইবে। আমার মনে হয় যে, উহা এবং এরূপ অন্যান্য ঘটনাই এদেশবাসী ও ইউরোপীয়ানদের মধ্যে ক্রমশঃ অসদ্ভাব বৃদ্ধি করিতেছে। পরিষ্কার বুঝা যায় যে, এরূপ ভাব চিরদিন থাকিবে না। কিন্তু এদেশবাসিগণ আত্মরক্ষার জন্য কি করিবে ইহাই সমস্যার বিষয়। সমস্যাটি কঠিন বটে, কিন্তু কঠিন হইলেও উহার মীমাংসা করিতেই হইবে। ইউরোপীয়ান ও এদেশবাসিগণের মধ্যে মামলামোকদ্দমার সংখ্যা বৃদ্ধি (বিশেষতঃ করিমগঞ্জ মহকুমায়) দেখিয়া মনে হয় যে, অবিলম্বে তাহার প্রতিবিধানের জন্য উপায় উদ্ভাবন করা উচিত। সৌভাগ্যের বিষয় যে, করিমগঞ্জের মিঃ স্কিনার এত ন্যায়পরায়ণ যে তাঁহার উপর এদেশবাসী এবং ইউরোপীয়ানদের মধ্যে সমভাবে বিচার করিবার ভার নির্ব্বিঘ্নে ন্যস্ত করা যাইতে পারে। কিন্তু চা-করগণের স্বজাতীয় একব্যক্তি বিচার করিবেন, ইহাই এদেশ-বাসিগণের নিকট অসন্তোষের কারণ হইয়া দাঁড়ায়। আমার মনে হয় যে, ইহার প্রতিবিধানের জন্য বিভিন্ন চা-

বাগানের কলিকাতাস্থ এজেন্টগণের নিকট এদেশবাসীর একটী আবেদন প্রেরণ করা উচিত এবং চা-করগণের ব্যয়ে প্রতিজেলায় একজন ইউরোপীয়ান পরিদর্শক বা শাসক নিযুক্ত করা নিতান্ত প্রয়োজন, এই কথা এজেন্টগণকে বুঝাইয়া দেওয়া উচিত। এরূপ কোন উপায় উদ্ভাবন করিলে ইউরোপীয়ান ও এদেশবাসিগণের মধ্যে সদ্ভাব প্রতিষ্ঠিত হইতে পারে।”

মিঃ জেম্‌স্ পিটার নামক দক্ষিণ শ্রীহট্টের জনৈক প্রসিদ্ধ চা-কর আমাকে ও আমার পত্রিকাখানিকে বর্ব্বর-ভাবে আক্রমণ করিয়া পত্র লেখায় উপরোক্ত পত্রখানি লিখিত হইয়াছিল। পত্রোল্লিখিত করিমগঞ্জের সবডিভি-শনেল অফিসার মিঃ স্কিনার চা-কর সম্প্রদায়ের অত্যন্ত অপ্রীতিভাজন হইয়া উঠেন। ভারতবাসীর সহিত তাঁহার সহানুভূতির নিদর্শন স্বরূপ একটী কৌতূহলোদ্দীপক ঘটনার উল্লেখ করিতে পারি—১৯০১ খৃষ্টাব্দে কলিকাতায় জাতীয় মহাসমিতির যে অধিবেশন হয় আমার প্ররোচনায় তিনি সেই সভায় উপস্থিত ছিলেন। তিনি শ্রীযুক্ত সুরেন্দ্রনাথ বন্দ্যোপাধ্যায় মহাশয়ের বক্তৃতায় এতই মুগ্ধ হইয়া পড়েন যে, বাগ্মীবরকে সম্মান প্রদর্শন মানসে তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার জন্য তিনি আমার নিকট ইচ্ছা প্রকাশ করেন। সময় নির্দ্দিষ্ট করিয়া

পরে তিনি সত্যসত্যই সুরেন্দ্রবাবুর সঙ্গে "বেঙ্গলী" আফিসে সাক্ষাৎ করিয়াছিলেন। প্রথম অবস্থায় মিঃ স্কিনার চা-কর সম্প্রদায়ের বিশেষ অনুরাগী ছিলেন এবং চা-কর-কুলী সংক্রান্ত কতকগুলি মোকদ্দমা উপলক্ষে বিচার-বিভ্রাট হওয়ায় "বেঙ্গলী" পত্রিকাস্তম্ভে তাহার তীব্রভাবে সমালোচনা করা হয়। কিন্তু তাহার পর হইতে তিনি একেবারে নূতন মানুষ হইয়া গিয়াছিলেন। চা-কর সম্প্রদায় তাঁহাকে জুজুর মত ভয় করিত। তিন চার বৎসর হইল তিনি বিহারের কোন জেলার ডিষ্ট্রিক্ট ও সেসন জজ থাকা অবস্থায় মারা গিয়াছেন।

সাহেবগণের সহিত আমি অনেক মেলামেশা করিয়াছি—কিন্তু তাহা প্রভু ও দাসভাবে নহে। সর্ব্বদা নিজের মর্য্যাদা বজায় রাখিয়া চলিয়াছি। তাহাদের পোষাক ও চালচলন অনুকরণ করিতে আমার কখনও প্রবৃত্তি হইত না। আমি উপলব্ধি করিতাম যে, মতামতের সম্পূর্ণ বিভিন্নতা স্বত্ত্বেও তাহাদের নিকট আমি সম্ভ্রমের পাত্র ছিলাম। আমি ব্যক্তিগতভাবে কত সাহেবের নিকট যে কত উপকার পাইয়াছি, তাহা কখনও ভুলিতে পারিব না। তাহাদের অনেকগুলি গুণ সম্বন্ধেও আমি অনেক কথা বলিতে

পারি। তাহাদের উদ্ধতভাব এবং প্রভুত্বব্যঞ্জক চাল-চলন সম্বন্ধে যে আমাদের অভিযোগ করিতে হয় তজ্জন্য আমরাই দায়ী। সাহেবদের সম্মুখে আমাদের অধিকাংশ দেশবাসিগণই যেরূপ দাসোচিত হীনভাব প্রদর্শন করেন তাহাতে আমার মনে হয় যে, ঐ জাতির নিকট হইতে ভাল ব্যবহার পাইবার আশা করা যাইতে পারে না। শাসকজাতি বলিয়া শ্রেষ্ঠত্বের দাবি করা তাহাদের পক্ষে কতকটা স্বাভাবিক।

"উইক্লি ক্রনিকেল" পত্রিকার প্রথম বৎসরেই, জলী সাহেব নামক আসামের একজন ইংরাজ একষ্ট্রা এসিষ্টেণ্ট কমিশনার সম্বন্ধে পত্রিকায় কতকগুলি গুপ্তকথা প্রকাশিত হওয়ায় হুলস্থুল পড়িয়া যায়। মিঃ জলী নিজের ডায়েরিতে মিথ্যা মন্তব্য লিখিয়া কার্য্যস্থান ছাড়িয়া কলিকাতায় ঘোড়দৌড় দেখিতে গিয়াছিলেন। পত্রিকায় তাহার বিরুদ্ধে নোটচুরির অপরাধ সম্বন্ধে ইঙ্গিত করা হইয়াছিল এবং কলি-কাতার "টারফ্ ক্লাবে" ঐ সকল অপহৃত নোটগুলির সন্ধান পাওয়া গিয়াছে, এরূপ লিখিত হইয়াছিল। এই সম্বন্ধে গবর্ণমেণ্ট গোপনীয়ভাবে অনুসন্ধান করেন এবং ফলে জলীসাহেব পদচ্যুত হন। জলীসাহেব পরে ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ৫০ হাজার টাকা দাবি করিয়া

আমার উপর নোটিশ জারি করেন এবং "বেঙ্গলী", "অমৃতবাজার পত্রিকা" ও কলিকাতার আরও কয়েকখানি সংবাদপত্র "ক্রনিকেল" হইতে উক্ত সংবাদ উদ্ধৃত করায় তাহাদের প্রত্যেকের নামে ২০ হাজার টাকার দাবিতে নালিশ রুজু করেন। "বেঙ্গলী" পত্রিকার উপর ৩০০৲ টাকার এবং অন্যান্য পত্রিকার উপর ১০০৲ টাকা করিয়া ক্ষতিপূরণের ডিক্রি হয়।

১৯০২ খৃষ্টাব্দে আমি "পুলিস কমিশনের" নিকট বে-সরকারী সাক্ষীরূপে জবানবন্দি দিবার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট কর্ত্তৃক মনোনীত হই। তখনকার শ্রীহট্টের সরকারী উকীল রায় দুলালচন্দ্র দেব বাহাদুর ও শ্রীযুক্ত কামিনীকুমার চন্দ মহাশয় অন্যতম সাক্ষী ছিলেন। আমার জবানবন্দি সংবাদপত্র সমূহের সবিশেষ মনোযোগ আকর্ষণ করিয়াছিল এবং এই সম্বন্ধে সমালোচনা করিতে গিয়া "অমৃতবাজার পত্রিকা" লিখিয়াছিলেন—"অন্ততঃ একজন ভদ্রলোক পুলিশ কমিশনের সমক্ষে উপস্থিত হইয়া পুলিশবিভাগ পরিচালন সম্বন্ধে কতকগুলি প্রকৃত গলদ নির্দ্দেশ করিয়া দিয়াছেন—তিনি শ্রীহট্টের উইক্লি ক্রনিকেল পত্রিকার সম্পাদক বাবু শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ। তাঁহার জবানবন্দি অন্যত্র প্রকাশিত হইল। মিঃ মালাবারির মত তিনি

সমস্ত দোষ পুলিশ বিভাগের নিম্নস্থ কর্ম্মচারিগণের উপর চাপাইয়া দেন নাই। ভারতীয় জনসাধারণের মতে পুলিশ বিভাগের প্রকৃত সংস্কার কিরূপে হওয়া প্রয়োজন, তাহা শশীন্দ্রবাবুর প্রদর্শিত পথ অনুসরণ করিয়া পুলিশ কমিশনকে স্পষ্টভাবে অন্যান্য সাক্ষিগণের বুঝাইয়া দেওয়া উচিত।"

শ্রীযুক্ত বিপিনচন্দ্র পাল মহাশয়ের তখনকার "নিউ-ইণ্ডিয়া" পত্রিকা লিখিয়াছিলেন—"আমরা আশা করি পুলিশ কমিশনের নিকট শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ যে জবানবন্দি দিয়াছেন তাহা বড়লাট বাহাদুরের মনোযোগ আকর্ষণ করিবে। বাবু শশীন্দ্রচন্দ্র সিংহ শ্রীহট্ট সহরস্থ উইক্লি ক্রনিকেল নামক সুপ্রসিদ্ধ সংবাদপত্রের সম্পাদক। ঐ পত্রিকাখানি সুদূর শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাদ্বয়ে রাজ কর্ম্মচারিদের ও শাসনকর্ত্তাদের কুকীর্ত্তি প্রকাশ করিয়া গবর্ণমেণ্ট ও জনসাধারণের প্রভূত কল্যাণ সাধন করিতেছে।"

ইহা বলিলে অত্যুক্তি হইবে না যে, স্যার ব্যামফিল্ড ফুলারের শাসন কালে কর্ত্তৃপক্ষ "উইক্লি ক্রনিকেল" পত্রিকাকে নানাপ্রকারে প্রলোভন দেখাইতে আরম্ভ করেন কিন্তু কিছুতেই উহাকে বশীভূত করিতে পারেন নাই। অবশেষে সদয় ব্যবহারে পত্রিকাখানি হাত করিতে না

পারিয়া স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলার বলপূর্ব্বক উহাকে বশ্যতায় আনিবার সঙ্কল্প করেন এবং সেই উদ্দেশ্যে পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট পত্রিকাখানিকে "বয়কট" বা বর্জ্জন করেন। আমার দোষের মধ্যে দোষ হইয়াছিল যে, বরিশাল সহরে কোনও এক মেথর রমণীর উপর একজন গুর্খা সিপাহির বলৎকার করার সংবাদ আমি কলিকাতার পত্রিকা সকল হইতে "ক্রনিকেলে" উদ্ধৃত করিয়াছিলাম। তজ্জন্য পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট আমাকে উক্তসংবাদের অসত্যতা স্বীকার ও ক্রটী স্বীকার করিবার জন্য আদেশ দেন। কিন্তু এই ব্যাপারটি সম্বন্ধে অনুসন্ধান করিয়া আমি যে বিবরণ প্রাপ্ত হইলাম তাহাতে এই সম্বন্ধে কোনরূপ ক্রটী স্বীকার করিবার কিম্বা উহা প্রত্যাহার করিবার কোন ন্যায্য কারণ দেখিতে পাইলাম না; কাজেই আমি গবর্ণমেণ্টের আদেশ পালন করিতে সম্পূর্ণ অসমর্থ, এরূপ উত্তর দিলাম। ইহার ফলে পত্রিকাখানির উপর "বয়কট" আদেশ হইল অর্থাৎ গবর্ণমেণ্টের নিকট হইতে গেজেট, অন্যান্য কাগজ ও বিজ্ঞাপন পাওয়া বন্ধ হইল এবং গবর্ণমেণ্টের নানাবিভাগ হইতে "ক্রনিকেল" লওয়া স্থগিত হইল।

"ক্রনিকেলের বয়কট" প্রসঙ্গ সমস্ত ভারতবর্ষের

সংবাদপত্র সমূহে বিশেষ আন্দোলনের বিষয় হইয়া পড়িয়াছিল এবং এই ব্যাপার সম্পর্কে আমার দৃঢ় আচরণকে অনেকেই বিভিন্নভাবে ভূয়সী প্রশংসা করিয়াছিলেন। লাহোরের "পাঞ্জাবী" পত্রিকা নিম্ন-লিখিতভাবে এবিষয়ে অভিমত প্রকাশ করেন—"আমরা সর্ব্বান্তঃকরণে আমাদের সহযোগীর আচরণ অনুমোদন করি। স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের শাসনবিভাগ পত্রিকাটী "বয়কট" করিয়াছেন বটে কিন্তু মিঃ সিংহ তাঁহার দৃঢ়তা, সাহসিকতা ও সহিষ্ণুতার জন্য ভারতীয় সংবাদপত্র সমূহের প্রশংসার যোগ্য। সেক্রেটারি রিজলী সাহেব "ষ্টেট্‌স্‌ম্যান" পত্রিকা সম্পর্কে যে আচরণ করিয়াছিলেন, সেক্রেটারি লায়ন সাহেবও দীনতার সহিত সেইভাবে দোষ স্বীকার করিবেন, তাহা আমরা আশা করিতে পারি না। এরূপ করিলে বুঝা যাইত যে, তিনি যে শাসনবিভাগের সেক্রেটারি তাহা সত্যসত্যই মহৎ কিন্তু আমরা জানি পূর্ব্ববঙ্গের শাসন কর্ত্তৃপক্ষের সেই মহত্ত্ব নাই। ইহা ব্যতীত, এই ক্ষেত্রে একখানি নিরুপায় ভারতীয় পত্রিকা সম্পর্কে ঘটনা হইয়াছে। উহার পক্ষ হইয়া বিলাতে আন্দোলন করিবে এমন কোনও বন্ধু নাই। সুতরাং পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্টের ভয় করিবার কিছুই নাই। মিঃ সিংহ যেরূপ নির্ভীক

ভাবে গবর্ণমেণ্টের আদেশের বিরুদ্ধে দাঁড়াইয়াছেন তাহা অতীব মহৎ, প্রশংসনীয় ও সম্মানার্হ।”

“ক্রনিকেল” পত্রিকার বয়কট ব্যাপার পরলোকগত মিঃ গোখেল মহোদয়ের দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়াছিল। তিনি ভারতীয় ব্যবস্থাপক সভার দুই অধিবেশনে তৎসম্বন্ধে প্রশ্ন জিজ্ঞাসা করেন, কিন্তু উহার কোনও প্রতিবিধান করিতে সমর্থ হন নাই। তাহার অল্পদিন পরে মিঃ গোখেল বিলাত যাত্রা করেন। তথায় ভিন্ন ভিন্ন স্থানে বক্তৃতাপ্রসঙ্গে তিনি “ক্রনিকেলের” বয়কট সম্বন্ধে উল্লেখ করিয়াছিলেন। আমি যতদূর জানি, লর্ড মর্লি'র সহিত এ বিষয়ে তাঁহার আলাপ হয়। তাহার ফলে, পূর্ব্ববঙ্গ ও আসাম গবর্ণমেণ্ট বয়কট আদেশ প্রত্যাহার করেন। ঐ আদেশ প্রত্যাহার করিবার পূর্ব্বে শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার সাহেব আমাকে তাঁহার বাংলায় ডাকাইয়া জানাইয়াছিলেন যে, স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের মতে পত্রিকাখানির সুর অত্যন্ত তীব্র এবং তিনি ইচ্ছা করেন এই তীব্র সুর যেন কতকটা সংযত করা হয়। অনেকক্ষণ তর্কের পর আমি ঐ মর্ম্মে অঙ্গীকার আবদ্ধ হইতে অসম্মত হইলাম। আমাদের এই কথোপকথন এত উত্তেজনাপূর্ণ হইয়াছিল যে, আমি বাসায় আসিয়া সমস্ত ব্যাপার লিপিবদ্ধ করিয়া

ফেলিলাম এবং উহার শুদ্ধতা স্বীকারের জন্য একখণ্ড প্রতিলিপি ডেপুটি কমিশনারের নিকট প্রেরণ করিলাম। তিনি উহার শুদ্ধতা স্বীকার করিলেন বটে কিন্তু তাহা পত্রিকায় প্রকাশ না করিবার জন্য সবিশেষ অনুরোধ জানাইলেন। এই প্রসঙ্গে তাঁহার নিম্নলিখিত মন্তব্যটি উল্লেখযোগ্য—"আপনাকে স্মরণ করাইয়া দিতে পারি যে, ব্যক্তিগতভাবে আপনি স্যার ব্যাম্‌ফিল্ড ফুলারের নিকট হইতে সর্ব্বদাই ভদ্রোচিত ব্যবহার প্রাপ্ত হইয়াছেন।"

বয়কট আদেশের প্রত্যাহার হওয়ায় আমি যে ন্যায় বা সত্যের জন্য বিরোধ করিয়াছিলাম তাহার জয় হইল বটে, কিন্তু আর্থিক হিসাবে পত্রিকার কোনও উপকার সাধিত হইল না। কারণ অতি অল্পকাল মধ্যে গবর্ণমেণ্ট এমন একটী কুটিল চাল চালিলেন যে অর্থাভাবগ্রস্ত পত্রিকাখানিকে আর বাঁচাইয়া রাখা গেল না। গবর্ণমেণ্টের অনুমতি লইয়া একজন পুলিশ ইন্সপেক্টর আসামের অপর প্রান্তে আমার বিরুদ্ধে একটী মানহানির মোকদ্দমা রুজু করিলেন। ঐ মোকদ্দমায় মাজিষ্ট্রেটের বিচারে দোষী সাব্যস্ত হওয়ায় আমার ও পত্রিকার প্রিণ্টারের ১৫০৲ টাকা করিয়া জরিমানা হয়। পরে আপীল আদালতে আমরা নির্দ্দোষ বলিয়া প্রতিপন্ন

হই। এস্থলে বলা অপ্রাসঙ্গিক হইবে না যে, উক্ত মোকদ্দমা রুজু হওয়ার পর একজন উচ্চপদস্থ রাজ-কর্ম্মচারি শ্রীহট্টে আসিয়া আমার নিকট প্রস্তাব করেন যে, যদি আমি বাদীর নিকট উপযুক্তভাবে ক্ষমা স্বীকার করি তবে মোকদ্দমা উঠাইয়া নেওয়া যাইতে পারে। কিন্তু আমি উক্ত প্রস্তাবে রাজি হইতে অস্বীকার করি। যাহাহউক, আত্মসমর্থন করিবার জন্য ৬।৭ শত মাইল দূরে যাতায়াতে বিশেষতঃ মোকদ্দমাটি বারবার মুলতবি হওয়াতে, এত টাকা ব্যয় হইল যে, অর্থাভাবে পত্রিকা-খানির অস্তিত্ব লোপ পাইল। বলা বাহুল্য, নয় বৎসর কাল পত্রিকাখানি চালাইতে গিয়া আথিক হিসাবে আমি অত্যন্ত ক্ষতিগ্রস্ত হইয়া পড়িয়াছিলাম। এই কয় বৎসর দেশের কাজ করিয়া আমার এই শিক্ষা হইয়াছিল যে, গবর্ণমেণ্টের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া অথচ দেশবাসী হইতেও উপযুক্ত সাহায্য না পাইয়া যিনি কর্ত্তৃপক্ষের দণ্ড বা অনুগ্রহের প্রতি দৃক্‌পাত না করেন এবং অবিচলিতচিত্তে জনসাধারণের অধিকার বিস্তার ও সংরক্ষণ করিবার জন্য কার্য্য করেন তাঁহাকে বাস্তবিকই অমানুষিক উদ্যম করিতে হয়। কিন্তু কেহ কোন প্রকার সাধুবাদ করুক আর নাই করুক আমি আমার সঙ্কল্প হইতে বিরত হইলাম না।

যে সময়ে জেলার চা-কর সম্প্রদায়, পুলিশ কর্ম্মচারি এবং উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত অন্যান্য রাজকর্ম্মচারিগণ সকলেই নিজ নিজ খামখেয়ালি অনুসারে কতকটা কঠোর ভাবেই কাজ চালাইতেছিলেন এবং জেলার কর্ত্তৃপক্ষের ভ্রূকুটিতে আমাদের মধ্যস্থ শ্রেষ্ঠতম ব্যক্তিগণও নত-কলেবর হইয়া পড়িতেন, তখন "উইক্লি ক্রনিকেলই" সর্ব্ব-প্রথমে জগত সমক্ষে প্রকাশ করে যে, এ প্রদেশেও এমন লোক আছেন যিনি জনসাধারণের স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর হস্তক্ষেপ, কোনও প্রকার জবরদস্তি বা বিদ্বেষমূলক বর্ণভেদ নীরবে সহ্য করিবেন না। করিমগঞ্জ লোকেল বোর্ডের সংস্কার-সাধন "ক্রনিকেলের" অন্যতম কীর্ত্তি। উক্ত লোকেল বোর্ডে চা-কর সভ্য-গণের প্রাধান্য থাকায় বোর্ডের কর্ম্মকর্ত্তাগণ ও অধীনস্থ কর্ম্মচারিগণ উক্ত সভ্যগণের আজ্ঞাবহ মাত্র ছিলেন; কাজেই সমস্ত ব্যাপারটী স্থানীয় স্বায়ত্তশাসনের ব্যঙ্গ-চিত্র মাত্র হইয়া দাঁড়াইয়াছিল। এই সকল ব্যাপার প্রমাণ ও বিবরণ সহ সময় সময় "ক্রনিকেলে" পত্রিকায় প্রকাশিত হইত। তাহার ফলে একজন মুসলমান জমিদারের সভাপতিত্বে করিমগঞ্জের জনসাধারণের একটী বৃহৎ সভার অধিবেশন হয় এবং তাহাতে বোর্ডের গঠন ও নিম্নপদস্থ কর্ম্মচারিগণকে পরিবর্ত্তন

করিবার প্রস্তাব গৃহীত হয়। এই প্রদেশে ইহার পূর্ব্বে বা পরে এরূপ দৃশ্য আর দৃষ্টিগোচর হয় নাই। ফলে গবর্ণমেণ্ট অল্পকাল মধ্যে প্রতিকারের ব্যবস্থা করেন এবং বোর্ডের দীর্ঘকালের সঞ্চিত আবর্জ্জনা চিরকালের মত দূরীভূত হয়।

বলাবাহুল্য যে, শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলায় স্বদেশী আন্দোলনে আমি বিশেষভাবে যোগদান করিয়াছিলাম এবং দুইটী জাতীয়-বিদ্যালয়, গ্রাম্য-সমিতি ইত্যাদির সংস্থাপন ব্যাপারে যথাসাধ্য চেষ্টা করিয়াছিলাম। যে অবস্থায় পড়িয়া অন্যান্য স্থানের এবম্বিধ অনুষ্ঠানগুলি বিনষ্ট হইয়াছিল এখানেও কালক্রমে তদ্রূপ অবস্থায় সেগুলি লয় প্রাপ্ত হয়।

১৯০৮ খৃষ্টাব্দের মধ্যভাগ হইতে ১৯১৩ খৃষ্টাব্দ পর্য্যন্ত যদিও আমার নিজের কোনও পত্রিকা ছিল না তথাপি এই অঞ্চলের উৎপীড়িত ও উত্যক্ত ব্যক্তিগণ সাহায্য লাভের আশায় আমার মুখাপেক্ষী হইত। এই পবিত্র কর্ত্তব্য হইতে আমি কখনও বিচলিত হই নাই। অনেক সময়ে নিজকে বিপদাপন্ন করিয়াও তাহা পালন করিয়াছি। এই প্রসঙ্গে দুইটী দৃষ্টান্ত বিশেষভাবে উল্লেখ করিতে পারি।

বঙ্গবিচ্ছেদ রহিত হইবার অব্যবহিত পরেই গর্ভন-

সাহেব মৌলবীবাজারের সবডিভিশনেল অফিসার ছিলেন। তিনি তাঁহার নানারূপ কঠোর ও অত্যাচার মূলক কার্য্যকলাপ দ্বারা স্থানীয় লোকের নিকট এতদূর বিরাগভাজন হইয়া পড়েন যে, মৌলবীবাজার-বাসিগণ ইহার প্রতিবিধানের জন্য অসংখ্য নাম দস্তখত করিয়া চিফ্ কমিশনার বাহাদুরের নিকট একখানা আবেদন পত্র প্রেরণ করেন। কিন্তু তাহাতে কোনও ফলোদয় না হওয়ায় তাঁহারা আমার সাহায্যপ্রার্থী হন। বিষয়টি বড়ই গুরুতর বুঝিয়া আমি ঐ কার্য্যভার গ্রহণ করি এবং গর্ডন সাহেবের বেআইনি কার্য্যকলাপ, স্বেচ্ছাচারিতা এবং প্রজাগণের স্বাধীনতা ও অধিকারের উপর অকারণ হস্তক্ষেপের বিশেষ বিশেষ উদাহরণ সমূহের প্রতি দৃষ্টি আকর্ষণ করিয়া চিফ্ কমিশনার মহোদয়ের নিকট একখানা পত্র লিখি। উহার উপসংহারে লিখিয়াছিলাম :—"উচ্চ ও মহৎ উদ্দেশ্য সাধনের জন্য যে রাজকর্ম্মচারি এখানে বিরাজ করিতেছেন আমাকে কর্ত্তব্যের খাতিরে তাঁহারই বিরুদ্ধে এই বিরক্তিজনক দুঃখের কাহিনী চিফ্ কমিশনার বাহাদুরকে শুনাইতে হইতেছে, ইহা বড়ই পরিতাপের বিষয় সন্দেহ নাই। কিন্তু ইহা অপেক্ষা আরও পরিতাপের বিষয় এই যে, শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার সাহেব মৌলবী বাজা-

রের এই সকল ব্যাপার সম্বন্ধে অবগত হইয়াও গর্ডন সাহেবের বিরুদ্ধে জনসাধারণের অভিযোগ সম্বন্ধে সম্পূর্ণ ঔদাসীন্য প্রকাশ করিতেছেন। অধিকন্তু তিনি গর্ডন সাহেবের কতকগুলি খামখেয়ালি ও স্বেচ্ছাচারিতা-মূলক কার্য্যকলাপের সমর্থনও করিয়াছেন। সুতরাং মৌলবীবাজারের ব্যাপার যে কলঙ্কজনক আকার ধারণ করিয়াছে তজ্জন্য তিনিও অনেকটা দায়ী। শুনা যায় যে, গর্ডনসাহেব কোন সুদূর সাধারণ আইন কানুন বর্জ্জিত (Non-regulation) প্রদেশ হইতে এখানে আনিত হইয়াছেন। সম্ভবতঃ তথায় এরূপ কঠোর প্রণালীতে কার্য্য করিয়া তাহার অভ্যাস হইয়া গিয়াছে। কিন্তু বলা নিষ্প্রয়োজন যে, এরূপ প্রণালী শ্রীহট্টের ন্যায় উন্নত জেলার শাসনে কোন প্রকারেই প্রযোজ্য হইতে পারে না। ডেপুটি কমিশনার বার্ণস্ সাহেব সম্বন্ধেও এই কথা বলা যাইতে পারে যে, শুধু আসাম উপত্যকার জেলা সমূহ শাসন করিয়া তিনি যে অভি-জ্ঞতা লাভ করিয়াছেন তাহা লইয়া শ্রীহট্টের ন্যায় উন্নত জনমতের মধ্যে কাজ করা তাহার পক্ষে সম্ভবপর নহে এবং তিনিও জনসাধারণের নিকট অত্যন্ত নিন্দার পাত্র হইয়া পড়িয়াছেন।”

স্যার আর্কডেল আর্ল সাহেব এই অভিযোগের

গুরুত্ব উপলব্ধি করিয়াছিলেন বলিয়া মনে হয়। কারণ এই সকল অভিযোগ প্রমাণ করিতে সমর্থ হইব কি না, তাহা জিজ্ঞাসা করিয়া তিনি অবিলম্বে আমাকে পত্র লিখেন। আমি সম্মতি জানাইয়া উত্তর দেওয়ায় তিনি সুরমাউপত্যকার কমিশনার এবং শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনার সাহেবকে এ সম্বন্ধে তত্ত্বানুসন্ধান করিবার জন্য আদেশ দেন। আমিও অনুসন্ধানকালে উপস্থিত থাকিবার অনুমতি পাই। জেরার সময়ে আমার উপর উপর্য্যুপরি প্রশ্নবাণ নিক্ষিপ্ত হইতে থাকে এবং অনুসন্ধানব্যাপারের আরম্ভ হইতে শেষ পর্য্যন্ত আমার সঙ্গে উত্তেজনাপূর্ণ তর্কবিতর্ক ও বাক্‌যুদ্ধ চলিতে থাকে। এই সমস্ত ঘটনার সম্পূর্ণ বিবরণ কলিকাতার ভারতীয় দৈনিকপত্রিকাসমূহে প্রকাশিত হইয়াছিল। আমার মনে হয় যে, এই অনুসন্ধানের ফলেই যে উত্তর-পশ্চিম সীমান্ত প্রদেশ হইতে গর্ডন সাহেবকে এখানে আনা হইয়াছিল পুনরায় সেইখানে ফিরিয়া যাইবার জন্য তাঁহার প্রতি আদেশ হয়। কিন্তু অল্পকাল মধ্যে তাঁহার এলাকায় আর একটী হুলস্থুল কাণ্ড সংঘটিত হওয়ায় তাঁহার বদ্‌লির আদেশ কয়েক মাসের জন্য স্থগিত থাকে। উক্ত ঘটনাটি "জগৎসী আশ্রমের মামলা" বলিয়া বিখ্যাত। ঐ ব্যাপারেও আমি জড়িত হইয়া পড়ি।

মৌলবীবাজার মহকুমার অন্তর্গত জগৎসী আশ্রমের অধিনায়ক স্বামী দয়ানন্দের ধর্ম্মমতের কিম্বা অনুষ্ঠান-পদ্ধতির সহিত আমার কোনও সম্পর্ক ছিল না। কিন্তু ১৯১২ খৃষ্টাব্দের ৬ই ও ৮ই জুলাই তারিখে জগৎসী আশ্রমে পুলিশ ও মিলিটারি সিপাহির অত্যাচারের ভীষণ কাহিনী শ্রবণ করিয়া আমি তৎ-প্রতি মনোযোগ দেই। ৬ই জুলাই তারিখে পুলিশ সুপারিন্‌টেণ্ডেন্টের অধীনে একদল সশস্ত্র পুলিশফৌজ উক্ত আশ্রম হইতে একটী অপ্রাপ্তবয়স্ক বালককে ধরিয়া আনিবার জন্য একখানা পরওয়ানা লইয়া সেখানে উপস্থিত হয় এবং তাঁহারা নিরস্ত্র ও অসহায় আশ্রম-বাসিগণের উপর গুলি চালাইয়া কয়েকজনকে আহত করে। দয়ানন্দের শিষ্য ও বিশ্ববিদ্যালয়ের সুপ্রসিদ্ধ ছাত্র বাবু মহেন্দ্রনাথ দে এম এ, বি এস্ সি গুলির আঘাতে প্রাণত্যাগ করেন। এই সমস্ত ঘটনার এক মাত্র কারণ খুব সম্ভব এই যে, আশ্রমবাসীদের মধ্যে একজন ত্রিশূল দ্বারা পুলিশ সাহেব ও তাঁহার ঘোড়াকে আঘাত করিয়া তাহাদের গতিরোধ করে। সম্ভবতঃ এই উত্তেজনার ফলেই এই সমস্ত কাণ্ড সংঘটিত হয়। কিন্তু এখানেই ঘটনার অবসান হইল না; ৮ই জুলাই তারিখে পুনরায় একদল গুর্খা মিলিটারি সিপাহি

তাহাদের অধ্যক্ষ ও শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনারের অধীনে তথায় যাইয়া আশ্রমের সমস্ত লোককে গ্রেপ্তার করে। আশ্রমবাসী স্ত্রীপুরুষ অনেকেই অল্পবিস্তর গুরুতর আঘাত প্রাপ্ত হন। আশ্রমবাসীরা অভিযোগ করেন যে, সঙ্গিন্ ও বন্দুকের বাট দ্বারা তাঁহাদিগকে এভাবে আঘাত করা হয়। তাঁহারা আরও অভিযোগ করেন যে, সিপাহির দল তাঁহাদের দেবমন্দির অপবিত্র, জিনিষপত্র লণ্ডভণ্ড ও লুটপাট করে, তাঁহাদিগকে পিছমোড়া করিয়া বাঁধিয়া রাখে এবং অন্যান্যপ্রকারে নির্য্যাতন করে। সরকারী পক্ষের সাক্ষীগণের জবানবন্দি হইতেও ইহা প্রকাশ পায় যে, যখন সিপাহির দল যুদ্ধের চালে তাঁহাদের আশ্রম দ্বারে উপস্থিত হয় তখনও আশ্রমবাসীরা কোনও প্রতিহিংসার ভাব প্রকাশ না করিয়া সঙ্কীর্ত্তনে আত্মহারা ছিলেন এবং বাহ্য বিষয়ে তাঁহাদের জ্ঞান ছিল না। সিপাহির দলের প্রতিরোধ করিবার উপযুক্ত কোনও বস্তুই তাঁহাদের নিকট ছিল না। অর্দ্ধডজন সন্ন্যাসীর ত্রিশূল ব্যতীত তাঁহাদের নিকট কোনও অস্ত্রশস্ত্র পাওয়া যায় নাই। কর্ত্তৃপক্ষ এই ত্রিশূলগুলি এতই নির্দ্দোষ বলিয়া বিবেচনা করেন যে পরে সেইগুলি আশ্রমবাসীদিগকে ফিরাইয়া দেন। গবর্ণমেণ্টের মনে এক অমূলক ধারণা

জন্মিয়াছিল যে, দয়ানন্দের সহিত রাজনৈতিক বিপ্লব-বাদিগণের সংস্রব আছে এবং ইহাই এই শোচনীয় পরিণামপ্রসূ ও অচিন্তনীয় সশস্ত্র অভিযানের মূল কারণ। স্থানীয় কর্ত্তৃপক্ষগণও ভীতিবিহ্বল হইয়া জগৎসী আশ্রমে পুলিশের গতিরোধ করিবার উপযুক্ত অস্ত্রশস্ত্র লুক্কায়িত আছে, এই ধারণা-মূলে কার্য্য করিয়াছিলেন। এই সমস্ত যে নিতান্তই গবর্ণমেণ্টের অলীক কল্পনাপ্রসূত তাহা পরবর্ত্তী ঘটনাবলী হইতে স্পষ্টভাবে বুঝা গিয়াছিল।

"অমৃতবাজার পত্রিকার" কর্ত্তৃপক্ষ যথেষ্ট ক্ষতি স্বীকার করিয়া এবং মস্ত বিপদের ঝোঁক মাথায় লইয়া এই ব্যাপারে যে সাহায্য প্রদান করিয়াছিলেন তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। পত্রিকাস্তম্ভে পুনঃ পুনঃ তীব্র প্রবন্ধ লিখিয়া জগৎসী ব্যাপার সম্বন্ধে যাহাতে একটী প্রকাশ্য তত্ত্বানুসন্ধান হয় সেই জন্য তাঁহারা এক প্রবল আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। ইহার ফলে, সুরমা উপত্যকার কমিশনার সাহেব মাসেক কাল পরিশ্রম করিয়া ঐ বিষয়ের তত্ত্বানুসন্ধান করেন। শ্রীহট্ট জেলার জনৈক স্বাধীনচেতা, অসাধারণ তেজস্বী এবং লোকহিতৈষী পুরুষ, করিমগঞ্জের উকীল পরলোকগত বাবু দেবেন্দ্রনাথ দত্ত মহাশয় অবৈতনিকভাবে আশ্রমবাসীদের পক্ষাবলম্বন

করিয়াছিলেন। গবর্ণমেণ্ট পক্ষে বারিষ্টার মিঃ এন্ গুপ্ত নিযুক্ত হইয়াছিলেন। আমি সংবাদপত্রের প্রতিনিধি স্বরূপ অনুসন্ধানকালে উপস্থিত থাকিয়া কার্য্যবিবরণ লিপিবদ্ধ করিয়াছিলাম। এই বিষয়ে গবর্ণমেণ্টের সিদ্ধান্ত যেরূপ হইবে মনে করা গিয়াছিল সেইরূপই হইল—অর্থাৎ তাহারা জগৎসী ব্যাপারে সংশ্লিষ্ট রাজ-কর্ম্মচারিগণের কার্য্যকলাপের সমর্থন করিলেন। ইহার জন্য শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার অনেক শিক্ষিত এবং প্রসিদ্ধ ব্যক্তিও কতকটা দায়ী ছিলেন। তাঁহারা এই সুযোগে দয়ানন্দের ধর্ম্মমতের উপর ঘৃণা ও ক্রোধ প্রকাশ করিতে গিয়া জগৎসী আশ্রমে পুলিশ অমানুষিক অত্যাচার করিয়াছে কি না, এই মূল বিচার্য্য বিষয়টিই চাপা দিয়া ফেলেন। এইরূপে অপরোক্ষভাবে তাঁহাদের সহায়তা পাইয়া গবর্ণমেণ্ট যদৃচ্ছাভাবে জগৎসী ব্যাপারের নিষ্পত্তি করিতে পারিয়াছিলেন।

জগৎসী ব্যাপারের দুঃখময় স্মৃতি লোকের মন হইতে মুছিয়া যাইতে না যাইতেই দুর্ভাগ্যবশতঃ মৌলবীবাজারে আর একটী ঘটনা ঘটিল। তথাকার সব্‌ডিভিশনেল অফিসার সাহেবের বাংলার প্রাঙ্গনে বোমার আঘাতে হত একজন যুবকের মৃতদেহ পাওয়া গেল। গর্ডন সাহেবের প্রাণসংহার করিতে গিয়া সেই দুরাত্মা

নিজেই নিজের মৃত্যুর কারণ হইয়াছিল, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। এই ঘটনা আসামের শাসনকর্ত্তাগণকে এতদূর ব্যতিব্যস্ত করিয়া তুলিল যে, জগৎসীর তত্ত্বানুসন্ধান ব্যাপারে যাঁহারা কোনও প্রকারে সংশ্লিষ্ট ছিলেন তাঁহারা সকলেই কর্ত্তৃপক্ষের বিশেষ সন্দেহ ও ক্রোধের পাত্র হইয়া পড়িলেন। আমার নিজের সম্বন্ধে বলিতে পারি যে, আমি প্রতি কাজে, বিশেষতঃ আমার নূতন পত্রিকা প্রতিষ্ঠা ব্যাপারে, কর্ত্তৃপক্ষের বিদ্বেষভাবের পরিচয় পাইতে লাগিলাম।

সেই সময়ে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলার কয়েকজন গণ্যমান্য ভদ্রলোকের চেষ্টায় "ইষ্টারণ্ ক্রনিকেল" (Eastern Chronicle) নামে একখানি ইংরাজি পত্রিকা প্রকাশ করিবার উদ্দেশ্যে "ন্যাশনেল পাব্লিশিং এজেন্সি" নামে একটী লিমিটেড্ কোম্পানী প্রতিষ্ঠিত হয়। শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাদ্বয়, পুনরায় আসামের চিফ্ কমিশনারের শাসনাধীনে আসায় লোকে একখানি পত্রিকার অভাব বিশেষভাবে অনুভব করিতেছিল। কোম্পানীর উদ্যোক্তাগণ আমাকে উক্ত পত্রিকা পরিচালনের ভার গ্রহণে যোগ্যতম ব্যক্তি বলিয়া বিবেচনা করেন এবং কার্য্যতঃ আমার উপরেই কোম্পানী সংস্থাপনের সমস্ত দায়িত্ব চাপাইয়া দেন। কোম্পানী

রেজেষ্টরী হইয়া যখন কার্য্যের সূচনা হইল তখন রাজকর্ম্মচারিগণ ভয়প্রদর্শন এবং অবশ্যম্ভাবী বিপদ সম্বন্ধে ভবিষ্যদ্বানী করিতেছেন, এইরূপ সংবাদ চতুর্দ্দিকে রাষ্ট্র হইয়া পড়িল। উক্ত কোম্পানীতে যাহাতে কেহ যোগদান না করেন সেই চেষ্টারও ক্রুটী হইল না। কর্ত্তৃপক্ষ শুধু প্রেস্ রাখার জন্যই ২০০০৲ টাকার জামিন চাহিলেন! শ্রীহট্টের তখনকার ডেপুটি কমিশনার কস্‌গ্রেভ সাহেব নিঃসঙ্কোচে আমাকে বলিলেন যে, ভূতপূর্ব্ব "উইক্লি ক্রনিকেল" পত্রিকার সহিত আমার সম্পর্ক থাকায় এবং জেলার কোন কোন ব্যাপারে আমি অগ্রণী থাকায় প্রেসের জন্য সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ টাকার জামিন দিতে হইবে।—তিনি যে গর্ডন সাহেব ও জগৎসী ঘটনা সম্পর্কীয় তত্ত্বানুসন্ধানের বিষয় ইঙ্গিত করিয়াছিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। আমি তাঁহাকে বলিলাম যে, আইন ও ক্ষমতা তাঁহার হাতে সুতরাং তিনি যাহা ইচ্ছা তাহাই করিতে পারেন; কিন্তু আমি এই ধারনাটি লইয়া ফিরিতেছি যে, আমাদের পত্রিকা প্রকাশের সঙ্কল্পটি বিনাশ করিবার উদ্দেশ্যে তিনি প্রথম হইতেই তাঁহার ক্ষমতা পরিচালনা করিতেছেন।

বস্তুতঃ মৌলবীবাজারের বোমাস্মৃতি সি আই ডি পুলিশের মনে জাগ্রত থাকায় জেলার মধ্যে তাহাদের

কার্য্যতৎপরতা এত বাড়িয়া গেল যে, আমাদের শিক্ষিত সম্প্রদায় অমূলক ভীষণ বিপদের আশঙ্কায় ভীতিবিহ্বল হইয়া পড়িলেন। অধিকন্তু চিফ্ কমিশনার স্যার আর্কডেল আর্ল মহোদয়ের সঙ্গে এ জেলার যে সকল ভদ্রলোকগণ সাক্ষাৎ করিবার জন্য যাইতেন তাঁহাদের মধ্যে অনেকের নিকট তিনি আমার নিজের সম্বন্ধে এবং আমার উদ্যোগে প্রতিষ্ঠিত পত্রিকা সম্বন্ধে নানাপ্রকার তীব্র মন্তব্য করিতে লাগিলেন এবং জনসেবক ও সংবাদপত্র-পরিচালক হিসাবে আমার চরিত্রের উপর অযথা অন্যায় দোষারোপ করিতে লাগিলেন। শিলংএ গবর্ণমেণ্ট গৃহে আহূত কোন এক দরবারে অভিভাষণ কালে এই প্রদেশের রাজনৈতিক অবস্থা সম্বন্ধে বলিতে গিয়া তিনি অসংযতভাবে সকলের দোষকীর্ত্তন করিলেন। এই সমস্ত কারণে জনসাধারণ অত্যন্ত সন্ত্রস্ত হইয়া পড়িল এবং জেলার মধ্যে স্বাধীনভাবে কাজ করা প্রায় অসম্ভব হইয়া দাঁড়াইল। সর্ব্বাপেক্ষা লজ্জা বা দুঃখের বিষয় এই যে, প্রেস্ স্থাপনে দুইজন বিশেষ উদ্যোক্তা (আসাম ব্যবস্থাপক সভার সভ্য ও অন্যান্য ভাবেও দেশে খ্যাতনামা ব্যক্তি) রাজকর্ম্মচারিগণের প্রভাব বশতঃ তাহাদের স্বহস্ত-গঠিত অনুষ্ঠানের সহিত সম্পর্ক

পরিত্যাগ করিলেন। এইরূপে সম্ভ্রান্ত ব্যক্তিগণের সাহায্য হইতে বঞ্চিত হইয়া আমি বিপন্ন হইয়া পড়িলাম। কিন্তু সেই অবস্থায় উদ্যমহীন হইয়া সঙ্কল্প পরিত্যাগ করিলে নির্ভীক ও স্বাধীনচেতা বলিয়া আমি যে যশটুকু অর্জ্জন করিয়াছিলাম, তাহা আমাকে হারাইতে হইত। ইহাছাড়া, আমার ভীত হইবারও কোনও কারণ ছিল না—কারণ আমি সর্ব্বদাই জানিতাম যে, জনসাধারণের জন্য আমি যে কার্য্য করিতেছি তাহা সম্পূর্ণরূপে নির্দ্দোষ এবং ব্রিটিশ প্রজাগণের না হউক অন্ততঃ অন্যান্য সভ্যজাতির চিরন্তন অধিকারের উপর তাহার প্রতিষ্ঠা। সঙ্গে সঙ্গে ইহাও আমি জানিতাম যে, আমি জীবনে যে পথ অবলম্বন করিয়াছি তাহাতে (বিশেষতঃ আসামের মত অনুন্নত প্রদেশে থাকিয়া) আমাকে বিস্তর দুঃখকষ্ট ভোগ করিতেই হইবে।

এমতাবস্থায় আমি এক নূতন উদ্যমে ব্রতী হইলাম—আসাম গবর্ণমেন্টের শাসননীতির কোন কোন বিষয়ে আলোচনা করিয়া বিশেষতঃ দেশে জনসাধারণের ন্যায্য ও আইনসঙ্গত সমস্ত চেষ্টাকে ব্যর্থ করিবার জন্য আসাম গবর্ণমেণ্ট যে সকল উপায় উদ্ভাবন করিয়াছিলেন তাহার তীব্র প্রতিবাদ করিয়া বড়লাট বাহাদুরের নিকট এক

আবেদন প্রেরণ করিলাম। মৌলবীবাজারের সবডিভিশনেল অফিসার গর্ডন সাহেবের বিরুদ্ধে আমার অভিযোগ, জগৎসী ঘটনা, মৌলবীবাজারে বোমা বিস্ফোরণ ব্যাপার, স্যার আর্কডেল আর্ল সাহেবের আমার প্রতি শ্লেষোক্তি, প্রেস্ রাখার জন্য সর্ব্বোচ্চ পরিমাণ টাকার জামিন নির্দ্ধারণ এবং চিফ্ কমিশনার মহোদয়ের দরবার-বক্তৃতা ইত্যাদি বিষয় আমি ঐ আবেদন পত্রে উল্লেখ করিয়াছিলাম। আমি কলিকাতার নেতৃবৃন্দের পরামর্শক্রমে এবং অধিকাংশের অনুমোদন মতেই এই অনন্যসাধারণ কার্য্যে হস্তক্ষেপ করিয়াছিলাম। শ্রীযুক্ত মতিলাল ঘোষ মহাশয় কিন্তু এই অভিমত প্রকাশ করিয়াছিলেন যে, আবেদন পত্র একজন প্রাদেশিক শাসনকর্ত্তার বিরুদ্ধে লিখিত বলিয়া বড়লাট বাহাদুর তৎপ্রতি কোনও দৃষ্টিপাতই করিবেন না এবং তাহা অপ্রয়োজনীয় কাগজের ঝুড়িতে নিক্ষেপ করিবেন। আমি তদুত্তরে তাঁহাকে বলিয়াছিলাম যে, আবেদন পত্রে কোনও বিষয়ে আমি কোনও প্রার্থনা করি নাই, কেবলমাত্র কতকগুলি ঘটনার বিবরণ এবং তাহা হইতে অনুমেয় সিদ্ধান্ত উহাতে লিপিবদ্ধ করিয়াছি—যদি দৈবক্রমে তাহা আসামের চিফ কমিশনার মহোদয়ের নিকট প্রেরিত হয় তাহা

হইলে আমার উদ্দেশ্য সফল হইবে। ভগবানের ইচ্ছায় তাহাই ঘটিয়াছিল। বড়লাট বাহাদুর আবেদন পত্রখানি আসাম গবর্ণমেন্টের নিকট পাঠাইয়া দেন এবং আসাম গবর্ণমেণ্টের সেক্রেটারি আমাকে নিম্নলিখিত ভাবে পত্র লিখেন :—"আমি আপনাকে জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, মহামান্য বড়লাট বাহাদুরের নামে লিখিত আপনার ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের ১২ই ফেব্রুয়ারি ও ১৫ই মার্চ্চ তারিখের পত্রদ্বয় আসাম গবর্ণমেন্টের নিকট প্রেরিত হইয়াছে। আপনাকে আরও জানাইতে আদিষ্ট হইয়াছি যে, বিহিত সরকারী মারফতে না পাঠাইলে ভারত গবর্ণমেন্ট আপনার কোনও পত্র গ্রহণ করিবেন না।"

যাহাহউক, আমি এই ব্যাপার সম্পর্কে আর বেশী অগ্রসর হওয়া উচিত মনে করিলাম না। কারণ উক্ত পত্রখানা স্যার আর্কডেল আর্ল সাহেবের বিদায় উপলক্ষে ইংলণ্ড যাইবার প্রাক্কালে লিখিত হইয়াছিল এবং তাঁহার অসাক্ষাতে এ বিষয়ে লেখালেখি করিয়া কার্য্যতঃ কোনও ফল হইত না। যদিও এই আবেদন পত্রে স্যার আর্কডেল আর্ল সাহেবের শাসনকার্য্যের বিরুদ্ধে প্রকাশ্য অভিযোগই ছিল তথাপি তিনি যে ইহা নীরবে গলাধঃকরণ করিলেন, তাহাতে কোনও সন্দেহ নাই। যাহাহউক আমার এই

আবেদন আসামের শাসনকর্ত্তাদের মেজাজ যথেষ্ট-ভাবে পরিবর্ত্তিত করিয়াছিল বলিয়া মনে হয়। এই আবেদনের ফলে, স্যার আর্কডেল আর্ল বাহাদুরের শ্রীহট্ট সম্বন্ধে যে সমস্ত ভ্রান্তধারণা ছিল তাহা সম্পূর্ণ-রূপে অপসারিত হইল এবং তাহার পর হইতে আমিও অপেক্ষাকৃত নিরুপদ্রবে কাজ করিবার সুযোগ পাইলাম। যে শ্রীহট্ট হইতে প্রায় তিনবৎসর কাল স্যার আর্কডেল আর্ল সশঙ্কভাবে দূরে রহিয়াছিলেন অবশেষে ১৯১৫ খৃষ্টাব্দে সেই শ্রীহট্টে তিনি পদার্পণ করিলেন। অবশ্য নিরপেক্ষভাবে বলিতে গেলে বলিতে হয় যে, জেলার কর্ত্তৃপক্ষগণই চিফ্ কমিশনার বাহাদুরকে ভ্রান্তপথে চালিত করিয়াছিলেন এবং বস্তুতঃ তাঁহার শাসনকালের শেষভাগে তিনি স্বচক্ষে সমস্ত বিষয় দেখিতে আরম্ভ করিলে পর জনসাধারণের নিকট যথেষ্ট সমাদরই লাভ করিয়াছিলেন।

১৯১৪ খৃষ্টাব্দে স্যার আর্কডেল সাহেবের বিদায়কালে অস্থায়ী চিফ্ কমিসনার কর্ণেল গর্ডন করিমগঞ্জ পরিদর্শন করিতে আসেন। সহরের অন্যতম গণ্যমান্য ভদ্রলোক হিসাবে সবডিভিশনেল অফিসার আমাকে জাহাজঘাটে চিফ্ কমিশনার বাহাদুরের অভ্যর্থনায় যোগদান করিবার জন্য নিমন্ত্রণ করেন এবং ব্যক্তিগতভাবে তাঁহার সহিত

সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক আছি কি না অনুসন্ধান করিয়া পাঠান। আমি তদুত্তরে জানাইলাম যে, যদি আমাকে দেশীয় পোষাকে উপস্থিত হইতে অনুমতি দেওয়া হয় তবে আমি অভ্যর্থনায় যোগদান ও সাক্ষাৎ করিতে ইচ্ছুক আছি। অভ্যর্থনা সম্বন্ধে তিনি আমার সর্ত্তে রাজি হইলেন, কিন্তু আমাকে জানাইলেন যে, অন্য বিষয়টি শ্রীহট্টের ডেপুটি কমিশনারের মতামতের উপর নির্ভর করে। পরে ডেপুটি কমিশনার মিঃ কস্‌গ্রেভ আমাকে জানাইলেন যে, তিনি (চিফ্ কমিশনার বাহাদুর) তাঁহার সহিত সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দিতে অসমর্থ হওয়ায় দুঃখিত আছেন। কি কারণে আমাকে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি দেওয়া হইল না তাহা জানিতে চাহিয়া আমি তৎক্ষণাৎ চিফ্ কমিশনার বাহাদুরের খাসসহকারীকে পত্র লিখিলাম। ইহার যে উত্তর পাইলাম তাহা হইতে স্পষ্ট বুঝা গেল যে, দেশীয় পোষাক পরিহিত ভারতীয় ভদ্রলোকের সহিত সাক্ষাৎ করিতে কর্ণেল গর্ডন সাহেবের বিন্দুমাত্র আপত্তি নাই—কিন্তু আমাকে সাক্ষাৎ করিবার অনুমতি না দেওয়ার যথার্থ কারণ কি, পত্রে তৎসম্বন্ধে কিছুই উল্লেখ করা হইল না। তাহার পর হইতে এরূপ কোনও সরকারী ব্যাপারে আমি নিমন্ত্রিত হই নাই।

এই পোষাকবিভ্রাট অবলম্বনে “বেঙ্গলী” ও “অমৃত-বাজার পত্রিকা” আমোদজনক সম্পাদকীয় প্রবন্ধ লিখিয়াছিলেন।

যাহাহউক, ২০০০৲ টাকার জামিনের নাগপাশ গলায় লইয়া “ইষ্টারণ্ ক্রনিকেল” (Eastern Chronicle) ১৯১৪ খৃষ্টাব্দের সেপ্টেম্বর মাসে কর্ম্মক্ষেত্রে অবতীর্ণ হয়। ইহা প্রকাশিত হইবার দুই মাস পরেই এলাহাবাদের “পাইওনিয়ার” প্রেস্ হইতে গুপ্ত প্রচারের জন্য মুদ্রিত “বার্লিন” নামক পুস্তিকা আবিষ্কার করিয়া তাহা লোকগোচর করে। পুস্তকখানিতে জার্ম্মেনির সহিত ভারতের ষড়যন্ত্র আছে এই মর্ম্মে এক সুদীর্ঘ ক্রোধোদ্দীপক অসম্ভব কাহিনীর অবতারণা করা হইয়াছিল এবং ঐ প্রসঙ্গে এই বিস্ময়কর কথা লিখা হইয়াছিল যে, ভারতীয় জাতীয় মহাসমিতি বার্লিন হইতে অর্থ সাহায্য পাইয়া থাকে। আমাদের এ অঞ্চলে ইহা সর্ব্বজনবিদিত যে, এই পুস্তিকার গ্রন্থকার ভারতীয় সিভিল সার্ব্বিসের একজন সভ্য এবং তিনি এক সময়ে এ জেলায় জেলা-ও-সেসন জজ ছিলেন। তিনি এখন আর চাকুরিতে নাই এবং শুনা যায় যে, অকালে বাধ্য হইয়া কার্য্য হইতে তাঁহার অবসর গ্রহণের সহিত উক্ত পুস্তক প্রণয়ণের কতক সম্পর্ক আছে।

যাহাহউক, নানা প্রকারে "ইষ্টারণ্ ক্রনিকেল" সমগ্র প্রদেশ ব্যাপিয়া জনসাধারণের সহানুভূতি আকর্ষণ করিয়াছিল। চা-করগণ, পাদ্রীসম্প্রদায় এবং রাজ-কর্ম্মচারিগণ সকলেই আগ্রহের সহিত উহা গ্রহণ করিতেন এবং আসামের চীফ্ কমিশনার বাহাদুর নিজেও পত্রিকাখানি প্রথামত খাসসহকারী মহোদয়ের নামে না পাঠাইয়া তাঁহার স্বনামে পাঠাইবার জন্য আমাদিগকে অনুরোধ করিয়া পাঠান। পত্রিকায় প্রকাশিত মন্তব্য ও সংবাদের উপর প্রায়ই সরকারী "কমিউনিক্" রূপে অথবা আমাদের নিকট পত্র লিখিয়া কোন না কোন জবাব কিম্বা প্রতিবাদ জানান হইত। আমি নিজেও উহার সম্পাদক হিসাবে দেশের বিবিধ ক্ষমতাশালী সম্প্রদায়ের প্রলোভন ও প্রভাবে অবিচালিত থাকিয়া পত্রিকার নির্ভীকতা ও তেজস্বিতার গৌরব অব্যাহত রাখিতে চেষ্টা করিয়াছিলাম। বস্তুতঃ, বলা অন্যায় হইবে না যে, স্বাধীনভাবে লোকমত ব্যক্ত করিতে বাঙ্গালা ও আসামের মফঃস্বলস্থ জেলা সমূহের মধ্যে "ইষ্টারণ্ ক্রনিকেল" একমাত্র পত্রিকা না হইলেও এরূপ অল্পসংখ্যক পত্রিকার অন্যতম ছিল। উহা দেশের 'হোমরুল' আন্দোলন প্রভৃতি উন্নত রাজনৈতিক মতের নিঃসঙ্কোচে পক্ষাবলম্বন করিয়াছে এবং প্রেস্ আইনের

কঠোর বিধান সত্ত্বে ও অন্যায় এবং অবিচারের কাহিনী প্রকাশ করিতে কখনও পশ্চাৎপদ হয় নাই। কিন্তু বলিতে দুঃখ হয় যে, যে লিমিটেড্ কোম্পানীর তত্ত্বাবধানে "ইষ্টারণ্ ক্রনিকেল" প্রতিষ্ঠিত হইয়াছিল তাহার উদ্যোক্তাগণের ঔদাসীন্য বশতঃ এবং গবর্ণমেণ্টের ভয়ে কোম্পানীর অংশ ক্রয় করিতে আমাদের অঞ্চলস্থ লোকের অনিচ্ছা হেতু এই অন্যথা আশাপ্রদ কোম্পানীটির এরূপ অর্থাভাব ঘটে যে পত্রিকাখানি রক্ষা করা অসম্ভব হইয়া পড়ে। আমি উহার জন্য বহু অর্থব্যয় ও নিজের দায়িত্বে উহার জন্য বহু ঋণ করিয়াছিলাম এবং কয়েক বৎসর ধরিয়া আমার সমস্ত সময়, শ্রম ও শক্তি কেবল উহাতেই নিয়োজিত করিয়াছিলাম। সুতরাং এরূপভাবে কোম্পানীটি ভাঙ্গিয়া যাওয়ায় আমি একেবারে সর্ব্বস্বান্ত ও নিঃস্ব হইয়া পড়ি।

এইরূপে অর্থাভাবে এবং ততোধিক দেশবাসীর সহানুভূতির অভাবে "ইষ্টারণ্ ক্রনিকেল" কাগজখানি উঠিয়া গেল—শশীন্দ্রচন্দ্রের 'সুখের স্বপন' ভাঙ্গিয়া গেল। বিশ বৎসরকাল সহস্র প্রতিকুলতার সহিত সংগ্রাম করিয়া বিশুদ্ধ নিষ্ঠার সহিত এক প্রাদেশিক সহরের নিভৃত কেন্দ্রে জনসেবা করিবার যে বিরাট সুখ ও শ্লাঘা, গৌরব ও দুঃখ শশীন্দ্রচন্দ্র অনুভব করিয়া আসিতেছিলেন দারিদ্রের পীড়নে সেই মহান্ সৌভাগ্য হইতে তিনি এখন বঞ্চিত হইয়া পড়িলেন। অবশেষে নিরুপায় হইয়া ১৯১৭ খৃষ্টাব্দের ডিসেম্বর মাসে শশীন্দ্রচন্দ্র

বড় অনিচ্ছায় শ্রীহট্ট পরিত্যাগ করিলেন। ইচ্ছা ছিল যে, শ্রীহট্টের বাহিরে দেশের সম্পন্ন ও হিতৈষী ব্যক্তিগণের নিকট অর্থ সাহায্য ভিক্ষা করিয়া "ইষ্টারণ্ ক্রনিকেল"কে পুনঃ প্রতিষ্ঠা করিবেন। কলিকাতায় আসিয়া অনেক গণ্যমান্য ভদ্রলোক হইতে তিনি এই সাহায্যের অনেক প্রতিশ্রুতিও পাইয়াছিলেন। কলিকাতার বৃহত্তর ক্ষেত্রে দশজনের নিকট হইতে অপ্রত্যাশিত সহানুভূতি পাইয়া শশীন্দ্রচন্দ্রের অবসন্ন হৃদয়ে দেশ সেবার সমস্ত আশা ও কল্পনা জাগ্রত হইয়া উঠিয়া ছিল। এই সময়ে শ্রীহট্ট ও কাছাড় জেলাকে বঙ্গপ্রদেশভুক্ত করিবার জন্য তিনি কলিকাতায় এক বিরাট আন্দোলনের সৃষ্টি করিয়াছিলেন। তখন কলিকাতার কোনও সুপ্রসিদ্ধ পত্রিকার কর্তৃপক্ষ উপযুক্ত বেতনে তাঁহাদের পত্রিকা সম্পাদনের কার্য্যভার গ্রহণ করিবার জন্য তাঁহাকে অনুরোধ করেন, কিন্তু শ্রীহট্টে জন-সেবার কার্য্যক্ষেত্র অপেক্ষাকৃত সঙ্কীর্ণতর হইলেও তাহা পরিত্যাগ করিয়া কলিকাতায় পত্রিকা সম্পাদনের কার্য্য করিয়া যশ উপার্জ্জন করা শশীন্দ্রচন্দ্রের জীবনের আকাঙ্ক্ষা ছিল না—কাজেই এই প্রস্তাবে তিনি অস্বীকৃত হইলেন। বস্তুতঃ কি করিয়া তাঁহার প্রাণাপেক্ষা প্রিয়তর "ইষ্টারণ্ ক্রনিকেল" পত্রিকাখানি পুনর্জ্জীবিত করা যায় তিনি তখন সেই চিন্তায়ই তন্ময় হইয়াছিলেন। ইতিমধ্যে অকস্মাৎ শশীন্দ্রচন্দ্র নিউমোনিয়া রোগে আক্রান্ত হইয়া পড়েন এবং জীবনের কার্য্য অসমাপ্ত রাখিয়া ১৯১৮ খৃষ্টাব্দের ১৯শে ফেব্রুয়ারি তারিখে অকালে ইহলোক হইতে বিদায় গ্রহণ করেন।